স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলনপত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৪ ও জুন ২০১৫

ইতিহাস (History)

ঐচ্ছিক পাঠক্রম (Subsidiary)

প্রথম পত্র (1st Paper)

S-1, SHI-1(New) Ancient & Medievel India)

ক) লেখমালা ও মুদ্রার সাহায্যে কীহাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুণগর্ঠন করা যায় ? দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করুন ?

উত্তর ঃ- তথ্য ছাড়া ইতিহাস চর্চা অসম্ভব, সাহিত্যিক মনগড়া কথা বলতে পারেন ঐতিহাসিক পারেন না, তাঁকে তথ্য বা উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে সেই তথ্য লুকিয়ে আছে। ইতিহাসের তথ্য হিসাবে সাহিত্যের মূল্য যাইহোক না কেন অতিরিক্ত হিসাবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত তথ্য হিসাবে সাহিত্যিক মূল্য অকিঞ্চিৎ কর। একারণে প্রত্নতত্ত্বের এত বেশি গুরুত্ব। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান গুলির মধ্যে লেখমালা প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাস যতটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার বেশিরভাগের জন্য আমরা লেখমালার কাছে "ঋণি"।

সাধারণভাবে পাথর, লোহা, তামা, রূপা, সোনার উপরে এবং মন্দির গাত্রে ও ইট, এমনকি বিভিন্ন মন্দির শাস্ত্রে লিপি খোদাই করা হত। প্রাচীনকালের সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যথা দিগ্বিজয়, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, শাসন পরিচালনা বিশেষ করে পর্বতগাত্রেই যে শিলালেখ পাওয়া যায় তাই নয়, মাটির তলা থেকেও বহু শিলা লেখ পাওয়া গিয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত শিলালেখই যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

ভাষা ঃ–

লেখমালার কি ধরনের ভাষা ব্যবহৃত হত সে সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমে জেনে রাখা প্রয়োজন যে হরপ্পা সভ্যতার লেখমালাগুলির ভাষা ও লিপি। সমৃদ্ধে এখনও আমরা অজ্ঞাত। এই কারণে সেখানে প্রাপ্ত অসংখ্য লেখমালার পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। এই শিলালেখ গুলি বাদ দিলে বলা যায় যে ভারতীয় লেখমালা প্রাকৃত। সংস্কৃত মিশ্রিত উপভাষা ও নানা আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত। অল্প কিছু লেখ পাওয়া যায় সেগুলি বিদেশীয়, বিশেষ করে গ্রীক বা আরাসীয় ভাষায় রচিত। আবার কিছু কিছু লিপি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রচলিত ভাষায় লেখা হত। যেমন খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে যে লিপিগুলি খোদাই করা হয়েছিল তার ভাষা ছিল প্রাকৃত।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রাকৃত ভাষার প্রচলন অনেকটা ম্লান হয়ে পড়ে। তবে তখন যে প্রাকৃত ভাষা একেবারে ব্যবহৃত হত না সেকথা বলা যাবে না। এরপর খ্রীষ্টিয় নবম ও দশম শতাব্দী থেকে শিলালিপি রচনার কাজে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা যথা সংস্কৃতি তামিল, তেলেগু প্রকৃতি ব্যবহৃত হতে থাকে।

বর্ণমালা ঃ–

লেখগুলিতে ব্যবহৃত লিপি বা বর্ণমালার প্রসঙ্গে বলা যায় যে ভারতীয় ভাষায় রচিত লেখগুলি ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী অক্ষরযুক্ত বিমিশ্রিত লিপি, তথাকথিত শঙ্খলিপি এবং ব্রাহ্মী থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন কয়েকটি আঞ্চলিক লিপিতে লেখা, অশোকের শিলালিপিগুলি উত্তর পশ্চিম ভারতের কয়েকটি এলাকা ছাড়া প্রধানত ব্রাহ্মী লিপিতেই লেখা। তবে খ্রীষ্টিয় ষষ্ট শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রাহ্মীই ছিল প্রধান ব্যবহৃত লিপি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্রাহ্মী লিপি লেখা হত বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। আর খরোষ্ঠী লিপি ডানদিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হত। শঙ্খ লিপিপাঠ করতে গেলেও অনেক সময় বাম দিকে পড়তে হয়। প্রায় সমগ্র এশিয়াতেই এই লিপির প্রায় ছিল।

প্রধানত প্রাকৃত ভাষায় ও ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ অযোধ্যা শিলালেখগুলি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার কাজে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। ১৮৩৭ খ্রীঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল এর সম্পাদক জেমস প্রিন্সেপ কর্তৃক অশোকের লিপির পাঠোদ্ধারের পর প্রত্নতত্ত্ব তথা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ, সাহিত্যিক সূত্র থেকে অশোকের সম্বন্ধ যে তথ্য পাওয়া যায় তা তাঁর মানবধর্মী ও বিশ্বজনীন। ক্রিয়াকলাপের সম্যক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে অক্ষম। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার কাজে অশোকের শিলা লেখগুলি এক মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল।

ঐতিহাসিক মূল্য ঃ–

ইতিহাস সম্পর্কিত ভাষাদের সম্পর্কিত আকর হিসাবে এই লেখগুলির মূল্য অপরিসীম। সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করলে এগুলি থেকে কেবল যে রাজনৈতিক, অর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক পরিস্ফুট নয়। তাই নয় বিভাজন ও পরিসরি বিষয়ক ধ্যান ধারনার ও পরিচয় ওমেনে এগুলি থেকে। সরকারি লেখগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল প্রশান্তি। এর আর একটি অংশকে বলা হয় ভূমিদান পত্র। প্রশান্তি রচনার পিছনে সাধারণত রাজ পরিবারের প্রেরণা কাজ করে থাকে। এই জাতীয় উপাদানের মধ্যে কিছু অংশ ভেঙে গেলেও সংস্কৃত ভাষায় রচিত তেত্রিশ লাইনের এই প্রশস্তিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এর থেকে কেবল যে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের বর্ণনাই পাওয়া যায় তাই নয়। গুপ্তযুগের ও তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক চিত্র ও প্রতিভাত হবে ওঠে। উদাহরণ হিসাবে আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশস্তির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সমীচীন হবে। এগুলি হল যথাক্রমে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তি, প্রতিহার রাজ মিহির ভোজের গোয়ালিয়র প্রশস্তি এবং সেন রাজ বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি।

তবে এই জাতীয় শিলালেখগুলি কিছু অতিশয়োক্তি থাকে। রাজকীয় শাসনব্যবস্থার অহেতুক প্রশংসা কিংবা গুনগানে এগুলি অনেক সময় মুখোরিত হয়। শাসকদের দুর্বলতার কথা এগুলিতে সযত্নে পরিহার করাও অবিশ্বাস্য নয়। তবে মিথ্যা ভাষন বা অতিরঞ্জম দোষে দুষ্ট হলেও এর ফলে লেখায় গুরুত্ব বিশেষ হ্রাস পায় না। কারণ যে বিশেষ উদ্দেশ্য রাজা বা রাজপুরুষেরা প্রশস্তিগুলির লেখাতেন সেই উদ্দেশ্যে বা লিপিবদ্ধ ঘটনার কোন পরিবর্তন হয় না। অতীতের নীরব স্বাক্ষী হয়ে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে এগুলি আজও ইতিহাস রচনায় আমাদের সাহায্য করে থাকে।

সরকারি লেখগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাম্রশাসনের মধ্যে পড়ে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাম্রশাসনগুলি খোদিত হত তাম্রফলকে। জমি বিক্রি বা জমিদান সংক্রান্ত বিষয় এগুলিতে লিপিবদ্ধ থাকত। এই ধরনের তাম্রশাসনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পালরাজাদের মুঙ্গের তাম্রশাসন। জমি বিক্রয় ও জমিদানের মধ্যে তাম্রশাসনগুলি জমি হস্তান্তরের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। সুতরাং তাম্রশাসনগুলি একদিকে যেমন শাসকের কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরন দেয় অপরদিকে তেমনি প্রাচীন বাংলার তথা ভারতের কৃষি অর্থনীতি বোঝার ক্ষেত্রে এগুলি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল।

AMBITION

বেসরকারি লেখ ঃ–

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় বেসরকারি লেখগুলিও বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। বেসরকারি লেখমালা বলতে সেই সমস্ত লেখাগুলিকে বোঝায় সেগুলি ধর্মীয় উদ্দেশ্য সরকারি এক্তিয়ারের প্রচারিত হত। সাধারণত দেবদেবীর মূর্তি বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গায়ে এই জাতীয় লেখগুলি খোদাই করা থাকত। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যিকগত ইতিহাস বোঝার জন্যও এগুলি প্রয়োজন। পূর্বের উল্লেখিত হরিসেন রচিত এ এলাহাবাদ প্রশস্তি ও রবিকীর্তির আইহোল প্রশস্তি এর চরম দৃষ্টান্ত। তাছাড়া তামিলনাড়ুর কুভুমিয়ামালাইয়ের সঙ্গীতের স্বরলিপি, রাজস্থানের উদয়পুরে নানা সর্গে, বিভক্ত রাজপ্রশস্তি কাব্য এবং আজমীরে ললিতবিগ্রহরাজ ও হরিসেন নাটক উৎকীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে।

বিদেশি লেখ ঃ–

শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতবর্ষের বাইরে প্রাপ্ত বহু লেখ এদেশের ইতিহাস রচনার কাজে সহায়ক হয়। এমনকি অনেকসময় বৈদেশিক লেখগুলি প্রাচীন ভারতের কয়েকটি তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ের ওপর নতুন ভাবে আলোকপাত করে থাকে। এ প্রসঙ্গে এশিয়া মাইনরে বোঘাজ কয় নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি লেখর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই লেখতে বৈদিক আর্যদের বিভিন্ন দেবতার উল্লেখ আছে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জবান দিন, কিভাবে সমৃদ্ধে হচ্ছে এবং লেখমালার ভূমিকা তাতে, কতখানি সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ লেখর উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একটি হল মধ্যপ্রদেশের মান্সাসোরের নিকটবর্তী রিস্থালে প্রাপ্ত ঔলিকর বংশীয় প্রকাশবর্মনের শিলালেখ, অপরটি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন, প্রথমটির তারিখ ৫১২ খ্রীঃ। উল্লেখ্য যে ১৯৮৩ খ্রীঃ আবিষ্কৃত লেখটি অনুমান করা হয়েছে যে বহুদিন আগে প্রাপ্ত মান্দাসোর শিলালেখ উল্লেখিত মালবরাজ যশোবর্ধনের আগের কোন শাসক ছিলেন প্রকাশ বর্মন। শুধু তাই নয় প্রকাশবর্মনের পূর্বপুরুষদের একটা তালিকাও আছে। আর দ্বিতীয় ১৯৮৭ খ্রীঃ আবিষ্কৃত লেখটি থেকে অনুমিত হয় যে বাংলার পাল শাসক দেবপালের পর প্রথম বিগ্রহপাল সিংহাসনে বসেছিলেন ধারণা ভুল।

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, লেখমালার পরেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উাৎস হল মুদ্রা; কিন্তু অধ্যাপক পি.এল. গুপ্ত বোধহয় তা মানতে রাজী নন। কারণ তার মতে–মানব সভ্যতা শুরু সময় থেকেই পণ্য বিনিময় এংব সংশ্লিষ্ট সমস্যা হিসাবে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়েছে বলে মনে করতে হবে। ধাতব খণ্ডকে মূল্যামানের একক হিসাবে ব্যবহার করা ভারতবর্ষে আনুমানিক খ্রীপূঃ সপ্তম-ষষ্ঠ শতকের আগে নেই। হরপ্পা সভ্যতায় শস্যকে বোধহয় মুদ্রার বিকল্প হিসাবে মনে করা হত। তবে কেউ কেউ ছোট ছোট শিলমোহরগুলিকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করা হত কিনা সেই প্রশ্ন তুলেছেন। ঋগ্বৈদিক যুগের পশুচারণ পরিবেশে গোরু ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের তুলনায় (ক) গরুকে স্থায়িত্ব অনেক বেশী। খ) সহজেই নষ্ট হয়ে যায় না। গ) খাদ্যের চাহিদা পূর্ণ করা যায়, ঘ) সর্বোপরি অন্যান্য সম্পদের মতো গোরুর সংখ্যা বাড়ে।

আলোচনার সুবিধার জন্যে প্রথমেই প্রাচীন মুদ্রাকে দেশীয় ও বিদেশীয় এই দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। আবার দাতর কণ্ড হিসাবে ভাগ করে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাচিন ভারতীয় মুদ্রার প্রাপ্তিস্থানের বিস্তৃতি এবং প্রাপ্ত মুদ্রার ধারাবাহিকতা জানবার জন্যে অমারা মুদ্রাগুলিকে যুগ অনুযায়ি ভাগ করতে পারি। এচাড়া প্রাচিন যুগের মুদ্রাকে প্রধাণত দুটি প্রদান শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (ক) গুপ্তপূর্ব যুগের চিহ্ন অঙ্কিত মুদ্রা এবং (খ) গুপ্ত সম্রাটদের প্রচলিত মুদ্রা। গুপ্ত উত্তর যুগের মুদ্রাকে অঞ্চলভিত্তিক ভাবে। (ক) সৌরাষ্ট্র ওমালবের মুদ্রা। (খ) দক্ষিণাপথের প্রাচীন মুদ্রা, (গ) উত্তরাপথের মধ্যযুগের মুদ্রা এবং (ঘ) পশ্চিম সীমান্ত ও মধ্যদেশ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়। বিদেশীয় মুদ্রাকে প্রধাণত (ক) গ্রীক রাজগণের মুদ্রা, (খ) শূক রাজগণের মুদ্রা, (গ) কুষাণ রাজাদের মুদ্রা, ঘ) জনপদ গুণসমূহের মুদ্রা– এই ভাগ করা যেতে পারে। ভারতীয় মুদ্রাকে আবার (ক) রাষ্ট্রিয় কর্তৃত্ব প্রচলিত মুদ্রা, (খ) বেসরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা মুদ্রা এবাবেও ভাগ করা যায়।

লেখমালার মতো মুদ্রার সাহায্যেরও ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করবার চেষ্টা করে থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইন্দো গ্রীক রাজাদের মুদ্রা আবিস্কৃত হলে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী জগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইন্দো গ্রীকদের সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বিপুল উৎসাহ দেখা যায়। শুশুমাত্র মুদ্রার সাহায্যেই ব্যাকট্রীয় গ্রীকদের ইতিহাস পুনর্গঠন করা সম্ভব। যেমন মুদ্রার সাহায্যে জানা যায় যে, রাজা ডিমিট্রাস হচ্ছেন প্রথম গ্রীক শাসক যিনি উত্তর পশ্চিম ভারতে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলন। নিজ কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য তিনি দ্বিভাষিক মুদ্রার প্রচলন করেন, রাজা মিনানন্দারের মুদ্রার বৈচিত্র এবং বিভিন্ন স্থানে তার প্রাপ্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সমস্ত ভারতীয় গ্রীক রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন শক্তিশালী। শুধুমাত্র মুদ্রার সাহায্যে আটত্রিশ জন ভারতীয় গ্রীক রাজা এবং দু'জন রানীর নাম জানা সম্ভব হচ্ছে, এদের মধ্যে মাত্র দু'জনের নাম লেখমালায় এবং সাত জনের নাম সাহিত্যক বিবরণীতে আছে। মুদ্রার সাহায্যে এটা প্রমাণ করা সম্ভব যে হেলিও ক্লেস শেহ ভারতীয় গ্রীক রাজা এবং তার পরই ভারতে গ্রীক রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায় লেখগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। কেননা এর বিষয়াস্ত রাজপ্রশস্তি, শাসন সংক্রান্ত আদেশ, স্থাপত্যকীর্তি কোন মূর্তির প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বর্ণনা, ভূমি ক্রয় বা দান প্রভৃতির লিপিবদ্ধকরন। লেখর গুরুত্ব এত বেশি যে অন্যকোন উৎস, বিশেষ করে সাহিত্য ও মুদ্রা থেকেও প্রাপ্ত তথ্য লেখ কর্তৃক অনুমোদিত।

খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

উত্তর ঃ-মৌর্যযুগ ভারতের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। মৌর্যদের শাসন ব্যবস্থার সু-সংগীতি উৎকর্ষ প্রাচীন যুগে বিশ্বের ইতিহাসে এক স্মরণীয় সংযোজন বিভিন্ন বিন্যস্ত, সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত রাজকর্মচারীদের পরিচালিত মৌর্যশাসন ব্যবস্থার যেরূপ পাই তা ভারতে ইতিহাসে অনন্য। মেগাস্থিনিসের বিবরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও অশোকের শিলালিপিগুলি থেকে আমরা মৌর্যশাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারি। মৌর্য শাসন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বিভিন্ন সুপরিকল্পিত বিভাগগুলি।

কেন্দ্রীয় শাসন ঃ–

কৌটিল্যের মতে রাজাই রাষ্ট্র (রাজা রাজ্যম)। তাঁর মতে রাজতন্ত্র যদিও দৈব নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান কিন্তু রাজা স্বয়হ দেবতা নন। কৌটিল্য লিখেছেন, "প্রজা সুখে সুখং রাজ্ঞ, প্রজানাং চ হিতে হিতম" অর্থাৎ প্রজাদের সুখে রাজার সুখ, প্রজাদের মঙ্গল রাজার মঙ্গল। রাজার ব্যক্তিগত সুখ বলে কিছু থাকতে পারে না, প্রজার হিত বলে তা রাজার হিত বলে বিবেচ্য। শাস্ত্র সম্মত বিধান ও প্রাচীন নিয়মকানুন অনুযায়ী রাজা রাজকার্য পরিচালনা করতেন। রাজাকে গুরুত্বপূর্ণ কার্যে ও উপদেশ দেবার জন্য সর্বদাই তাঁর পার্শ্বে ব্রাহ্মণ পুরোহিত রূপে উপস্থিত থাকত। রাজা পুরোহিতদের মতামত গ্রহণ করতেন।

আইন প্রণয়ন, কর্মচারী নিয়োগ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা ইত্যাদি রাজার আদেশানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হত। কৌটিল্যের মত রাজার সজীব বা অমাত্য উপাধাধারী মন্ত্রীদের সহায়তায় রাজকার্য পরিচালনা করতেন। এছাড়া মন্ত্রী পরিষদ নামে রাজার এক পরামর্শ সভা ছিল। কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে রাজা মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ নিতেন। অবশ্য এই পরিষদ আধুনিক গণতান্ত্রিক পরিষদ নয়, অনেকটা আমলাতন্ত্রের মিলিত নেতৃত্ব। মেগাস্থিনিস মন্ত্রীদের "সভাপদ" বলেছেন। কৌটিল্য দুই প্রকার মন্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন, "মন্ত্রী ও আমাতা"। "মন্ত্রী" নামধারী ব্যক্তিরাই ছিলেন উঁচু দরের সচিব। অশোক তাঁদের "মহামাত্য" আখ্যা দেন।

শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজা অধ্যক্ষ বা বিভাগীয় প্রধান কর্মচারী নিয়োগ করেন। এঁকেই ছিলেন মৌর্য শাসন ব্যবস্থার মেরুদন্ড স্বরূপ। গ্রীক লেখকরা এঁদের "ম্যাজিস্ট্রেট" রূপে অভিহিত করেছেন। অর্থশাস্ত্রের বত্রিশ প্রকার অধ্যক্ষ ও তাঁদের দায়িত্বের উল্লেখ আছে। অধ্যক্ষরা রাজস্ব আদায়, বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক সংগ্রহ, বলে সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করতেন। অর্থশাস্ত্রে রাজকর্মচারীদের বেতনের হারও উল্লেখ আছে। প্রত্যেক বিভাগে বহুসংখ্যক নিম্ন কর্মচারী নিয়োগ করা হতো।

মেগাস্থিনিসের বিবরণানুযায়ী উচ্চপদে দুই শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী ছিলেন। "এগ্রোনময়" এবং "অসিতময়" জমির পরিমাণ, নদীর

AMBITION

তত্ত্বাবধান, ও খালের জল সহজ প্রাপ্য করবার দায়িত্ব "এ্যাগ্রোনময়" নামক কর্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ রাজধানী শাসনের ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

প্রাদেশিক শাসন ঃ–

মৌর্য সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। অশোকের সময় পাঁচটি প্রদেশ ছিল বলে জানা যায়। এগুলি হল উত্তরী পথ, অবন্তী, দক্ষিণা পথ, কলিঙ্গ ও প্রাচ্য। প্রাদেশিক শাসন কর্তারা সাধারণতঃ রাজ পরিবার থেকে নিযুক্ত হতেন। তাঁদের "কুমার মাত্য" বলা হত। রাজধানীর নিকটবর্তী প্রদেশের শাসনভার সম্রাট স্বহস্তে গ্রহণ করতেন। প্রত্যেক প্রদেশ কয়েকটি "বিষয়" বা জেলাতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক "বিষয়" আবার কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামের শাসনভার "গ্রামিন" বা "গোপ" নামে পরিচিত দায়িত্বশীল কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকত। তিনি গ্রামের বয়ঃজৈষ্ঠ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। জেলার শাসক ছিলেন স্থানিক "প্রদেষ্ট" নামক কর্মচারী "স্থানিক" ও "গোপ" গণের কার্য পরিদর্শন করতেন। এইভাবে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উপর ভিত্তি করে মৌর্য শাসন গড়ে উঠেছিল ?

পৌর শাসন ব্যবস্থা ঃ–

মৌর্য শাসন ব্যবস্থা প্রতিটি প্রদেশের ন্যায় প্রতিটি নগর বা শহরে পৌর শাসন ব্যবস্থা বা Municipal-Ad-Ministration গড়ে উঠেছিল। রাজধানী শাসনের দায়িত্ব "অষ্টিনদের" হাতে দেওয়া হয়েছিল। রাজধানীর ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিল। এক একটি সমিতিতে পাঁচজন করে সদস্য ছিল। প্রত্যেক সমিতির উপর এক একটি বিশেষ দায়িত্বভার দেওয়া থাকত। এই ছয়টি সমিতি হল — (১) শিল্প পরিচালন, (২) বিদেশীদের আপ্যায়ন, (৩) ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ), (৪) জন্ম-মৃত্যুর হিসাব সংরক্ষণ, (৫) শিল্পজাত পণ্যবিকীর ও তত্ত্বাবধান এবং (৬) বিক্রীত পণ্যের উপর ১/১০ ভাগ শুল্ক আদায়করণ। এই ছয়টি সমিতি নির্দিষ্ট কার্য ছাড়াও সামগ্রিক ভাবে জনসাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ করত।

সামরিক ব্যবস্থা ঃ–

বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য সুরক্ষার জন্য মৌর্য সাম্রাজ্য সুরক্ষার জন্য মৌর্য সম্রাটরা এক উন্নত সামরিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সমগ্র সামরিক ব্যবস্থা মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি বিভাগে পাঁচজন করে সদস্য সেনা অফিসার থাকতো। এই ছয়টি সামরিক বিভাগ হল – (১) পদাতিক, (২) অশ্বারোহী, (৩) রথারোহী, (৪) রনহস্তীবাহিনী (৫) রণতরীবাহিনী ও (৬) রসিদ পত্র সরবরাহকারী বাহিনী। প্লিনীর বর্ণনাতে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সেনাবাহিনীতে - ৬,০০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বারোহী, ৯০০০ হাতি, ৮০০০ রথ ও কিছু রণতরী ছিল। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, জলদস্যু দখলে রণতরীগুলির প্রয়োজন ছিল।

বিচার ব্যবস্থা ঃ–

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র মতে দুটি বিচারালয় ছিল দেওয়ানী ও ফৌজদারী ব্যবস্থার ন্যায়। "ধর্মাস্থায়ী" হল দেওয়ানী ও "কন্টক শোধন" হল ফৌজদারী বিচারালয়। নগরে "নগর ব্যবহারিক" ও গ্রামে গ্রামিকরা বিচারের কাজ করতেন। তবে বিচারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজা সবসময় নিজে গ্রহণ করতেন। অপরাধ অনুযায়ী মৃত্যুদন্ড, অঙ্গছেদ, শূলে চাপানো, জরিমানা, বেত্রাঘাত ইত্যাদি হত। "অর্থশাস্ত্রে" ১৮ প্রকার দন্ডা দেশের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া সংগ্রহণ স্থানীক ও দ্রোনমুখ প্রভৃতি নিম্ন আদালত ও বিদ্যমান ছিল। বিচারে সর্বদাই নিরপেক্ষতা গৃহীত হত।

রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ–

মেগাস্থিনিসের মতে ভূমিরাজস্ব ছিল জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস্য। উৎপন্ন ফলের ১/৬ ভাগ রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হত। তবে কৌটিল্যের মতে ১/৪ ভাগ রাজস্ব ছিল। ১/১০ ভাগ শুল্ক ব্যবসা বাণিজ্য থেকে সংগ্রহ করা হত। ভূমি রাজস্ব নগর বা উৎপন্ন শষ্যের মাধ্যমে দেওয়া হত। একে বলা হত ভাগ। এছাড়া পথকর, জলকর, ফেরীকর, চারণকর, বিবাহকর, গৃহকর, জন্ম-মৃত্যুকর ইত্যাদি আদায় করা হত। এগুলি "বলি" বলা হত। তাই ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা যথার্থই বলেছেন – সমৃদ্ধ অর্থনীতি শাসনকে সুগঠিত করতো।

গুপ্তচর বিভাগ ঃ–

মৌর্য শাসনের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য গুপ্তচর নিয়োগ। সারা রাজ্যে অসংখ্য গুপ্তচর ছিল। অর্থশাস্ত্রে দুরকম গুপ্ত চরের কথা বলা হয়েছে। যথা সংস্থা (স্থানীয় গুপ্তচর) এবং সঞ্চারা (ভ্রাম্রমান গুপ্তচর) উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সকলের মনোভাব ও গতি বিধি লক্ষ্য রাখতো গুপ্তচররা। সম্রান্ত ব্যক্তি ও বহুনারী এই গুপ্তচর বিভাগে ছিল। রাজ প্রসাদ ও রাজার প্রহরী হিসাবে নারীরা বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল।

উপসংহার ঃ–

পরিশেষে বলা যায় যে, মেগাস্থিনিসের বিবরণ, অর্থশাস্ত্র ও অশোকের শিলালিপিগুলি থেকে মৌর্য শাসন ব্যবস্থার যে স্বরূপ দেখা যায় তা খুব সপরিকল্পিত শাসন ব্যবস্থা ছিল। অর্থশাস্ত্রের উপর নির্ভর করলে মৌর্যশাসন ব্যবস্থা নির্মম বলে মনে হয়। কিন্তু মৌর্য শাসন ব্যবস্থা অবিমিশ্রিত স্বৈরতন্ত্র নয়। রাজার ক্ষমতা সীমাহীন ছিল না। রাজা এক মহান আদর্শে পরিচালিত হত। বস্তুতঃ ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে মৌর্যযুগ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছে।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

ক) হরপ্পা সভ্যতায় বাণিজ্যের ভূমিকা বিশ্লেষন করুন।

উত্তর ঃ-সমৃদ্ধ কৃষির ওপর ভিত্তি করে হরপ্পাবাসীর অর্থনৈতিক জীবন গড়ে ওঠে। এদের সভ্রান্তদের আমোদ প্রমোদের জন্য অট্টালিকা ছিল এবং তাদের সেবায় নিযুক্ত অসংখ্য দাস দাসী দুই কামরাযুক্ত ইস্টকনির্মিত কুটিরে বাস করত। সিন্ধু উপত্যকার অধিকাংশ লোকের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। এদের অপর বৃত্তি ছিল ব্যবসা বাণিজ্য। ভারতের ভিতরে ও বাহিরে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য চলত। জলপথে মিশর ও স্থলভাগপথে বেলুচিস্তান, সুমেরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ ভারতের মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে সিন্ধুর বণিকরা পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাতায়াত করত। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বাইরে থেকে আমদানি সকরা হত। যেমন সৌরাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্য থেকে শঙ্খ ও কয়েকটি বিশেষ ধরনের পাথর, হিমালয় থেকে দেবদারু কাঠ, পারস্য কিংবা রাজস্থান থেকে তামা, পারস্য ও আফগানিস্তান থেকে রূপা। সিন্ধুর কিছু সীলমোহর মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া গেছে। মনে হয় ভারতীয় বণিকদের কেউ কেউ মেসোপটেমিয়ায় বসবাস করত। লোথালে খননকার্যের ফলে যে তথ্য পাওয়া রগেছে তা সামুদ্রিক তৎপরতার ইঙ্গিত দেয়। লোথাল থেকে রপ্তানি পণ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল হাঁতির দাঁত, হাতির দাঁতের চিরুনী, নানা মনিমুক্তা, সূতীবস্ত্র, ময়ুর ইত্যাদি। সুষার থেকে আমদানি করা হত প্রধানত রূপা। সিন্ধুর তুলাজাত সামগ্রী মেসোপটেমিয়ায় রপ্তানি করা হত। পরে ব্যবিলোনিয়াতেও সিন্ধুর সূতীবস্ত্রের করা হত। পরে ব্যাবিলোনিয়াতেও সিন্ধুর সূতীবস্ত্রের করা হত। পরে ব্যাবিলোনীয়তেও সিন্ধুর সূতীবস্ত্রের বেশ চাহিদা ছিল। বিনিময় প্রথা অনুসারে কেনা বেচা ও লেন দেন চলত। কারণ তখনও মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়নি।

AMBITION

সামুদ্রিক তৎপরতা ঃ–

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে সামুদ্রিক তৎপরতার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত নর কঙ্কালে ঝিনুকের বলয় ও মুক্তা খচিত অলংকার পাওয়া গেছে। আর রয়েছে ঝিনুক নির্মিত হাতা বা চামচ। বৃহদাকার ঝিনুক একমাত্র গভীর সমুদ্রেই পাওয়া সম্ভব। সুতরাং ঝিনুকের সাক্ষ্য অভ্যস্থ ছিল। এই বৃহদাকার ঝিনুক সম্ভবত ভারতীয় সমুদ্রোপকূলে আহার্য ছিল মাছ। মাছের মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্যের প্রাচুর্য বেশী দেখা যায়। এ ব্যতীত কতকগুলি সীলমোহরে মৎস্যের প্রতিচ্ছবি খোদিত দেখা যায়। আবার কতকগুলি সীলমোহরে নোঙ্গররত নৌকার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত লোথালের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রোতাশ্রয়ের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এটি দৈর্ঘ্যে ৭১০ ফুট ও প্রস্থে ১২০ ফুট। পোতাশ্রয়ের এই আয়তন থেকে অনুমান করা যায় যে, তা বৃহদাকার জাহাজ নোঙ্গর করার জন্য ব্যবহৃত হত। এছাড়া মিশর,

সুমের, ক্রীট, পারস্য প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সিন্ধুবাসীদের জলপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ডক্টর ম্যাকির মতে সমুদ্রপথেই সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে মিশর, ইলাম প্রভৃতি স্থানের যোগাযোগ ছিল।

ঘ) ধর্মপালের কৃতিত্ব আলোচনা করুন ?

উত্তর ঃ- গোপাল পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেও তাঁকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব পুত্র ধর্মপালের। ধর্মপাল উত্তর ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। এই সূত্রে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সাথে তাঁর তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। অবশ্য কনৌজের ওপর আধিপত্যকে কেন্দ্র করে ঐ সংগ্রাম চলেছিল বলে ধর্মপাল অন্যান্য অঞ্চলে নির্বিবাদে রাজ্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন। ধর্ম পালের রাজ্য জয়ের তালিকা বিশাল। তিনি ভোজ, মৎস্য, মদ, করু, যবন, অবন্তীগান্ধার কীরগণ প্রভৃতি জয় করে প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতের শাসনকর্তা হয়ে বসেছিলেন। কোনো কোনো সূত্রে জানা গিয়েছে যে, ধর্মপাল গাহঢ়বাল ও নেপাল এরও অধিপতি ছিলেন। আর প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সাথে তাঁর সংগ্রামে কোন পক্ষই স্থায়িত্বভাবে জয়লাভ করেনি। কখনও ধর্মপাল, আবার অন্য সময় প্রতিহার বা রাষ্ট্রকূটরা জয়ী হত। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে ধর্মপালের রাজ্যসীমা ছিল উত্তর হিমালয়, পশ্চিমে সিন্ধু, ও দক্ষিণে বিন্দপর্ত। আর বাংলার পুরোটা তো তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলই। ধর্মপালের সাথে তিব্বতের রাজার সুসম্পর্ক ছিল। ধর্মপালের প্রতিভা কেবল রাজ্যজয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। পরধর্মসহিষ্ণু ও বিদ্যোৎসাহী রাজা হিসেবেও তিনি একজন কীর্তিমান পুরুষ। ধর্মপালের অপর এক নাম ছিল 'বিক্রমশীল'। বিহারের মগধে তিনি রাধানী স্থাপন করে সেখানে একটি বোদ্ধধর্ম মঠ নির্মাণ করেন, যার নাম ছিল 'বিক্রমশীল বিহার'। তাছাড়া তদন্তপুরী বা সোমপুরী বিহার ও তাঁরই উৎসাহে নির্মিত হয়েছিল। শোনা যায়, ধর্মপাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কমপক্ষে ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। এই সব শিক্ষা কেন্দ্রে বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিতেরা অধ্যাপনার কাজ করতেন। ধর্মপাল বৌদ্ধ হলেও পর ধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন না। গর্গ নামে জনৈক ব্রাহ্মাণ তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করতেন।

ঙ) চোল শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য কী কী ছিল ?

উত্তর ঃ- পল্লব শক্তির প্রাধান্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চোল শক্তির প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নবম শতাব্দের মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দের শেষ দিক পর্যন্ত চোল রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই এই অঞ্চলে তাদের শাসন জারী করেন।

চোল শাসনব্যবস্থা জানার জন্য প্রধানত লেখার উপর নির্ভর করতে হয়। চালুক্য রাষ্ট্রকূটদের রাষ্ট্রবিন্যাস ও চোলদের রাষ্ট্র বিন্যাসের মৌলিক পার্থক্য ছিল। সামন্ত নরপতিরা চালুক্য রাষ্ট্রকূট রাজাদের উচ্চাশাকে খর্ব করতেন। একমাত্র চোলরাই দীর্ঘকাল সামন্ত নরপতিদের প্রভাব কমিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। এযুগে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যাপকভাবে কৃষকদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

চোল আমলে জাঁকজমকপূর্ণ রাজতন্ত্রকে অনেকে বাইজানটাইন রাজতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাজার অভিধা ছিল "চক্রবর্তীগল"। কার্যকরী রাজতন্ত্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা রাজার কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করতে, তিনি সে সম্পর্কে মৌখিক অনাদেশ দিতেন, এই আদেশের অনুলিপি কেন্দ্রীয় অথবা স্থানীয় শাসন কর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হত। আইন প্রনয়ন নয়, সামাজিক বিধান রক্ষা ও বলবৎ করাই ছিল রাজার কাজ।

কর্মচারীদের উচ্চনীচ ভেদাভেদ ছিল। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাধারণত পেরুন্দরম ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের "সিরুদনম" বলা হত। উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী কর্মচারীদের বলা হত মানুষের সঙ্গে বা নিজের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করতো। পদগুলি বংশানুক্রমিক হওয়ার প্রবনতা ছিল।

গ্রাম ছিল এই শাসন ব্যবস্থার সর্ব নিম্নস্তর। গ্রামের সমষ্টিকে বলা হত কুররম বা নাড়ু বা কোট্টম। কয়েকটি কুররম নিয়ে একটি বলনাড়ু গঠিত হত। কতকগুলি বড়নাড়ু নিয়ে গঠিত হতো "খন্ডলুম" বা প্রদেশ। এভাবেই রাষ্ট্রবিন্যাস করা হয়েছিল চোলদের রাজত্বকালের শেষে প্রদেশের সংখ্যা ছিল আট কি নয়টি। এ সময় রাষ্ট্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমিকর। এছাড়াও আমদানি রপ্তানি শুল্ক, নগরে প্রবেশ দ্বারে দেয় ওল্কও খনি অরণ্য থেকে রাজস্ব আসত। যুদ্ধ এবং মন্দিরের প্রয়োজন, বাঁধের সংস্কার কার্যের জন্য করদাতাদের সম্মতি নিয়ে অতিরিক্ত কর ধার্য করা হতো।

গ্রাম সভাগুলির বিচার সম্পর্কিত ব্যাপক ক্ষমতা ছিল। রাজকীয় আদালতগুলিকে "ধর্মাসন" বলা হত। মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য আইনজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সাহায্য নেওয়া হত। "উর" এবং "সভা" নামে দুটি নাম সমিতি ছিল। এছাড়াও ব্যবসায়ীদের সমিতিকে "নগরম" বলা হত। এই প্রাথমিক সমিতিগুলি সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করতো। স্থানীয় সমিতি গুলির মধ্যে উর ছিল সবচেয়ে সহজ ও সরল। প্রয়োজন অনুসারে উর এককভাবে, অথবা সভার সঙ্গে যৌথভাবে কার্যনির্বাহ করতো। গ্রাম এর কর দাতাদের নিয়ে উর গঠিত হত। অপর দিকে সর্বত্রই সভা ব্রাহ্মণ গ্রাম অর্থাৎ চতুর্বেদিমঙ্গল মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। উপনিবেশগুলিতে ব্রাহ্মণরা সভার মাধ্যমে স্থানীয় কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন।

নাড়ুর নিজস্ব সভা ছিল, এই সভাগুলি ভূমি রাজস্ব প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই নাড়ুর ক্ষেত্রে অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করত। সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে "মধ্যস্থ" ও "করণত্তার" গ্রামীন প্রতিষ্ঠানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন।

সর্বোপরি বলা যায় যে চোল শাসনব্যবস্থা ছিল এক যুক্তি পূর্ণ উন্নত শাসন ব্যবস্থা যার একদিকে ছিল যোগ্য আমলাতন্ত্র আর অপরদিকে ছিল স্থানীয় সক্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলি ফলে এক পরিপূর্ণ ও উচ্চমানের শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল।

৩। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন ?

ক) সিন্ধু সভ্যতার নাগরিক জীবন।

উত্তর ঃ- আয়তন, বৈচিত্র এবং প্রত্নবস্তুর বিশিষ্টতার দিক দিয়ে বিচার করলে সমস্ত হরপ্পীয় প্রত্নক্ষেত্রগুলির মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। সিন্ধুনদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত মহেঞ্জোদারো এবং আধুনিক রাভি নদীর বাম তীরে হরপ্পা। যদিও কোন লিখিত প্রমাণ নেই তবুও প্রত্নতাত্ত্বিকরা হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোকে বিশাল হরপ্পা সাম্রাজ্যের যুগ্ম রাজধানী বলে বর্ণণা করেন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে বিভিন্ন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকরা বহুবার এই শহর দুটিতে উৎখননের কাজ চালিয়েছেন কিন্তু নানারকম ভূ-তাত্ত্বিক এবং ভৌগলিক অসুবিধার জন্যে সর্বস্তরে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও বিশাল হরপ্পা এলাকায় এক দরণের সহমত এবং সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়।

হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনায় খানিকটা নিয়মমাফিক ছক আছে তা অনস্বিকার্য। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এই নগর পরিকল্পনার বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। যেমন কালিবঙ্গানের উঁচু এলাকা দুটি ভাগে বিভক্ত। এই ব্যবস্থা অন্য কোথাও নেই অন্যদিকে, অধুনা আবিস্কৃত ধোলাবিরাতে নগর তিনভাগে বিভক্ত (১) উঁচু শহর, (২) মাঝের শহর ও (৩) নীচে শহর। মাঝের শহর নগরীর আর কোথাও নেই। গুজরাটের উপকূলে অবস্থিত লোথাল একটি বন্দর নগরের ভূমিকা থাকতে পারে; ফলে এই নগরের পরিকল্পনা অন্যান্য হরপ্পীয় নগরের থেকে পৃথক। হরপ্পীয় শহরগুলির স্থাপত্য সম্বন্ধে প্রচলিত দারণাকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ জ্যাকমেন কিছেুটা সংশোধন করেছেন। তিনি স্বীকার করছেন, এই নগর স্থাপত্যের পিছনে প্রতিভা ও মার্জিত রুচির ছাপ পাওয়া যায় কিন্তু পরিকল্পনার মূল ভিত্তি বোধ হয় গ্র-নক্ষত্রাদির অবস্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। একেই তিনি 'Cosmological Principles' বলতে চান। সাধারণের বসতি এলাকাতে বর্গাকৃত উঠান ছিল একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। উঠানকে কেন্দ্র করে ছোটবড় বিভিন্ন কামরাবিশিষ্ট ঘর, রান্নাঘর, স্নানাগার ইত্যাদি। আন্নমা সারকিনা মহেঞ্জোদারোর সাধারণের গুরগুলি পরীক্ষা করে বিভিন্ন ধরণের উঠানের খোঁজ পেয়েছেন এবং তার বিভিন্ন ব্যবহারও লক্ষ্য করেছেন। যেমন কোনো ক্ষেত্রে উঠানগুলো বাস্তবাড়ির প্রয়োজনে, কোথাও হাতের কাজ করবারে জন্যে, কোথাও বা উভয়বিধ কাজ করবার জন্যে ব্যবহৃত হত।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার কাজে জলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই কি বাস্তবাড়িগুলিতে জলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্যে

AMBITION

কুঁয়োর ব্যবস্থা ছিল ? কোথাও বাড়ির নিজস্ব কুঁয়ো অথবা দুটি বাড়ির মাঝে কুংয়োগুলিকে দেখতে পাওয়া যায় । বহু লোক যে কুঁয়ো ব্যবহার করতেন, সেখানে বসবার জায়গা আলাদা করে তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল । জ্যানসন হরপ্পায় শহরের কুংয়োগুলির ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের প্রশংসা করেছেন । মহেঞ্জোদারোতে প্রতি তিনটি পরিবার পিছু একটি কুঁয়ো দেখা যায়, যা সমসাময়িক মিশর বা মেসোপটেমিয়াতে বিরল । কিন্তু কালিবঙ্গানে কাছাকাছি নদীর অবস্থান থাকার জন্যে কুঁয়োর ব্যবহার বিরল ।

নাগরিক সভ্যতার অপর একটি বৈশিষ্ট্য আমরা হরপ্পা রাস্তাগুলির মধ্যে খুঁজে পাব । একটি নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করে শহরগুলোতে রাস্তা তৈরী করা হয়েছিল । প্রদান প্রধান রাস্তাগুলি শহরের উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত ছিল, এই রাস্তাগুলি শহরকে কয়েকটি প্রধান আয়তক্ষেত্রকার ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল । স্টুয়ার্ড পিগট মনে করেছেন যে যদি এই ছক মহেঞ্জোদারোতে সর্বত্র অনুসরণ করা হয়ে থাকে তাহলে দেখা যাবে যে বারোটি বড় বড় বাড়ি তিন সারি রাস্তার চারটি ভাগের মধ্যে পড়েছে এবং পশ্চিমদিকের কেন্দ্র রয়েছে সিটাডেল বা দূর্গ এলাকা । মেহে-জোদারোতে এইচ .আর . এলাকার ৩০ ফুট চওড়া রাস্তাগুলি কয়েক সারি চাকাওয়ালা যানবাহনের জন্যে উপযুক্ত ছিল । সমস্ত রাস্তা অত চাওড়া ছিল না, লোথাল ও কালিবঙ্গান মহেঞ্জোদারোর মতো চওড়া রাস্তা দেখা যায় না । কিন্তু প্রতিটি সোজাসুজি তৈরী করবার প্রবণতা দেখা যায় । বড় চওড়া রাস্তার পাশে সরু অপ্রশস্ত গলি এবং সেখানে ছিল বাড়িগুলির সদর দরজা । সোজা রাস্তা এবং দক্ষিণ দিকে বাঁক নেওয়ার প্রবণতা হরপ্পা নগর পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য । কিন্তু একটা জিনিস ভাবতে অবাক লাগে যে এত চওড়া রাস্তা কিন্তু পথচারীদের চলবার জন্যে ফুটপাতের কথা ভাবা হয়নি । শুধু মহেঞ্জোদারোতে ডি .কে . এলাকাতে এবং কালিবঙ্গানে সামান্য ইঙ্গিত মেলে ।

নগর পরিকল্পনা করার সময় পরিকল্পান রচয়িতারা সৌন্দর্যের চেয়ে প্রয়োজনীয়তার কতা বেশি করে ভেবেছেন । যেমন জনস্বাস্থ্য বা সমবেতভাবে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্যে মহেঞ্জোদারোতে একটি স্নানাগার নির্মাণ করা হযেছিল । কৃত্রিম এই জলাশয়টি শহরের উঁচু এলাকায় অবস্থিত, আয়তক্ষেত্রাকার এই জলাশয়টি একটি প্রশস্ত আঙ্গিনার মাঝখানে অবস্থিত এবং লম্বা ও চওভায় ৩৯ ফুট x ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট । ওঠাবার ও নামবার সিঁড়ি, চারপাশে ছোট ছোট ঘর, উৎকৃষ্ট ইঁটের কাজ, কৃত্রিমভাবে জল ভরবার এবং বের করে দেবার পদ্ধতি সবই এই স্থাপত্যকর্মটিকে বিশিষ্টতা দান করে ।

ঘ) সভা ও সমিতি ।

উত্তর ঃ-বৈদিক সাহিত্য উল্লিখিত দুটি গনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হল "সভা" ও "সমিতি" । "সভা" হল – এবং সমিতি হল ..... এদের গঠন ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না । সভাকে গ্রাম্য পরিষদ ও সমিতিকে জনপরিষদ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । রমেশচন্দ্র মজুমদার সভাকে স্থানীয় ও সমিতিকে কেন্দ্রীয় পরিষদ বলে বর্ণনা করেছেন । সভার তুলনায় সমিতি ছিল অনেক বেশী গণ প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠান । সমিতি ছিল অভিজাত ও সাধারণ মানুষের মিলনস্থল । সমিতির অধিবেশনে উপস্থাপিত থাকা রাজার এক মহান কর্তব্য বলে বিবেচিত হত । ঋকবেদে এক স্তোত্রে নির্দেশ আছে যে, জনসাধারণ যেন সংঘবদ্ধ ভাবে সমিতির অধিবেশনের যোগ দেয়, এক সুরে বক্তব্য রাখে, অন্য দিকে সভা ছিল বয়স্কদের প্রতিষ্ঠান, সভায় মহিলাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, প্রথম দিকে সমিতি রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত । .... মনে করেন, " ..... " .

কিন্তু কালক্রমে রাজার উপর এই দুই সংস্থার নিয়ন্ত্রণ থাকলেও সকল বিষয়ে রাজার ক্ষমতা অপ্রতিহত হয়ে ওঠে । প্রাপ্ত সাক্ষ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় –

১) সমিতি বৈদিক জনপদগুলির সাধারণ পরিষদ ছিল ।

২) সমিতির সংগঠন ছিল সামরিক ।

৩) রাজ্যের পরিধি ও রাজার ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলে সমিতির গুরুত্ব কমে যায় এবং কালক্রমে তা বিলুপ্ত হয় ।

৪) কিন্তু সভার অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং পরবর্তীকালে তা অভিজাত সম্প্রদায়ের পরিষদ বা মন্ত্রীপরিষদে রূপান্তরিত হয় । এককথায় বলা যায় যে, শাসন বিচার ও জনহিতকর কার্যসংক্রান্ত ব্যাপারে এই সংস্থা দুটি অংশগ্রহণ করত ।

ঘ) কণিষ্কের শাসন ব্যবস্থা ?

উত্তর ঃ- বিম কদফিস বা দ্বিতীয় কদফিসের পরে কুষান রাজ্যের সিংহাসনে বসেন কণিষ্ক, তার আরোহনকাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও কনিষ্কই যে কুষান বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এ বিষয়ে সবাই একমত, তিনি নিজেকে দেবপুত্র বলে অভিহিত করতেন । পরাক্রান্ত দিগবিজয়ী সুশাসক, বৌদ্ধ ধর্ম এবং শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে কনিষ্ক ভারত ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অলৌকিত করে আছেন ।

কণিষ্ক স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন । প্রকৃত পক্ষে তার স্বৈরাচার নিরঙ্কুশ ছিল না । এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে ।

প্রথমত ঃ– তিনি তার অনেক ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসক কর্তাদের হাতে অর্পন করেছিলেন ।

দ্বিতীয়তঃ– তার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অর্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র ও উপজাতি ছিল ।

তৃতীয়তঃ– তার একটি মন্ত্রী পরিষদ ছিল ।

তিনি ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপদের মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে তার বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতেন । পারস্য সাম্রাজ্যের অনুকরণে তিনি তার শাসনব্যবস্থা তৈরী করেন । এই ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপরা বেশী অধিকার ভোগ করত । এই পদ বংশানুক্রমিক ভাবেও পেতে পারত ।

সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ নিতেন । প্রধান মন্ত্রী ছিলে মাথর, অপর এক মন্ত্রী দেবধর্মের পরিচয় ও পাওয়া যায় । তার পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন অশ্বঘোষ, চরক এবং সংঘরক্ষা । অশ্বঘোষ ছিলেন কণিষ্কের আধ্যাত্মিক গুরু, চরক ছিলেন চিকিৎসক এবং সংঘরক্ষা ছিলেন পুরোহিত ।

তার শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তরে থাকত গ্রাম যার প্রধানকে "গ্রাফিক" বলা হত । এছাড়াও বিভিন্ন বৃত্তির এবং ধর্মীয় দান সম্পর্কিত বিষয়ে দেখা শুনার জন্য বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী বা পিন্ড ছিল । অট্টালিকা সমূহ নির্মাণ এবং সংস্কারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন "নবকর্মিক" নামক কর্মচারী । রাজ্যজয় এবং সাম্রাজ্যের ছিল । প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের শাসন কার্যে সহায়তা করার জন্য নিযুক্ত হতেন । সাম্রাজ্য শাসনের কাছে তিনি বহু কুষান, শক এবং হুনদের নিযুক্ত করেছিলেন । এরা বেশিরভাগই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে এরা আচারে অনাচারে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন ।

কনিষ্কের সুশাসন ক্ষমতা, পরধর্মে সহমর্মিতা, ইত্যাদি গুনগুলি তাকে বিশাল সাম্রাজ্য শাসনে সহযোগীতা করেছে । ডঃ ভি .এ .স্মিথ তার বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য "দ্বিতীয় অশোক" আখ্যায় ভূষিত করেছেন । কিন্তু পরবর্তী অযোগ্য শাসকগণের শাসনকার্যে অদক্ষতার জন্য অচিরের কুষান সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে ।

ঙ) গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি ?

উত্তর ঃ-গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ছিলেন সাতবাহন বংশের রাজা শুধু রাজা নয় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজা তার সম্পর্কে লেখ থেকে জানা যায় । এটি নাসিক লেখ নামে পরিচিত । তার রাজত্বকাল সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখ নাসিক প্রশস্তি ।

কয়েকটি সুত্র অনুসারে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজত্বকালে সম্পর্কে জানা যায় । প্রথম দিকে তিনি নাহপানের সমসাময়িক ছিলেন মধ্যে নাসিক লেখতে আছে যে গৌতমপুত্র নহপানের জামাতা নাসিক ও পুনা অঞ্চলে শাসক ঋকদন্ডের অধিকারভুক্ত জমি অন্যকে দান করেছিলেন ।

AMBITION

সাতবাহন সেনাবাহিনী যখন জয়লাভ তৎপর, তখন একটি সামরিক ছাউনি থেকে এই দানপত্রটি প্রচারিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় গৌতমীপুত্র নিজে তখন নাসিক অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ২৪ বৎসরের রাজত্বকালের বেশিরভাগ ছিল খ্রিষ্ঠীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে রাজত্ব করেন এবং গৌতমীপুত্র নহপানের রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর সমসাময়িক ছিলেন।

গৌতমীপুত্র মহারাষ্ট্র এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশ সমূহ পুনরুদ্ধার করে সাতবাহন বংশের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠান করেন। সাতবাহন কুলযশ প্রতিষ্ঠাপন কর। আখ্যা দেওয়া হয়েছে নাসিক প্রশস্তিতে। তার প্রধান কৃতিত্ব হল মহারাষ্ট্র পুনরুদ্ধার। তার রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে প্রচারিত নাসিক লেখতে কানাড়া অঞ্চলে বেজয়ন্তী অন্তভুক্তির বিশেষ উল্লেখ আছে।

একমাত্র দক্ষিণ দিক ভিন্ন মগধের অন্য তিন দিক নদীবেষ্টিত ছিল। সুতরাং নৌবাণিজ্যের জন্য মগধের অবস্থান ছিল অনুকূল। স্থল বাণিজ্য ও মগধের গুরুত্ব কম ছিল না। কেননা ওড়িষ্যা ও উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত পথ মগধের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল।

মূল্যায়ণ ঃ–

পরিশেষে বলা যায় খ্রীঃ পূঃ ষষ্ট শতাব্দীতে খন্ড ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত ভারত মগধের এই উত্থানকে সম্ভব করেছিল। একটি গভীর অরণ্য রাং কুল বিন্ধ্য পর্বতমালা এবং অন্যটি ভারতীয় জাতি ও উপজাতির অস্তিত্ব। এই দুই কারণে মগধের শাসকেরা পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এসে তারা সফল হন। ঐতিহাসিক রামশরন শর্মা এইসব প্রাকৃতিক আনুকূল্যকে মগধের একমাত্র সাফল্যের কারণ মনে করলেও ডঃ এল এল ব্যাসাম ও ডঃ রমিলা থাপার প্রমুখ মনে করেন যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় মগধের খুব দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

AMBITION

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলনীপত্র (Assignment), ডিসেম্বর, ২০১৪ ও জুন, ২০১৫

ইতিহাস (History)

সহায়ক ডাঠক্রম (Subsidiary)

দ্বিতীয়পত্র (2nd Paper)

(S-2, SHI-II : Early Modern and Modern Indian (1707-1964)

New Syllabus : From July 2010 Enrolment Session

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

ঘ) ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন ?

উত্তর ঃ- পশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলার একদল তরুণ ভারতের সনাতন প্রথাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন এবং প্রাচীন কুপ্রথা ও রক্ষনশীলতার ধংসসাধনের জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁদের আন্দোলন নব্যবঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিত। হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র নেতৃত্বে হিন্দু কলেজের প্রাঙ্গন থেকেই নব্যবঙ্গ আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল।

ডিরোজিওর নেতৃত্ব -

যুক্তিবাদী দীক্ষাদান- জাতিগতভাবে বিদেশী হলেও তিনি জন্মেছিলেন ভারতবর্ষে। তিনি ভারতকে মাতৃভূমির মতো বালোবেসে এরে সামাজিক কলুষতাকে দূর করার জন্য যুক্তিবাদকে প্রতিহটতি করতে চেয়েছিলেন। দার্শনিক সক্রেটিস যেমন এথেন্সে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যুক্তির আলোক প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, তেমনই দার্শনি বেন্থামের হিতবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ডিরোজিও নবশিক্ষা ও যুক্তির প্রখর ঔজ্জ্বল্য নিয়ে তাঁর ছাত্রদের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করার শক্তি জুগিয়েছিলেন।

অনুগামীদের ভুমিকা - ডিরোজিও-র অনুগামীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্যাঁরীচাঁদ মিত্র, লাল বিহারী দে, মাধব চন্দ্র, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তিনি তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে হিন্দুসমাজের কুসংস্কারগুলিকে দূর করতে চেয়েছিলেন।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন গঠন - ডিরোজিওর অনুগামীদের 'ডিরোজিয়ান' বলা হত। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে ডিরোজিও তাঁর ছাত্র মণ্ডলীকে নিয়ে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তোলেন। এই সংগঠনটি ছিল ভারতের প্রথম ছাত্র সংগঠন এবং বাংলার প্রথম বিতর্ক সভা। এর সভাপতি ছিলে ডেভিড হেয়ার। অ্যাকাডেমীর অ্যাসোসিয়েশনের বিবিন্ন সভায় দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দেশপ্রেম ইত্যাদি নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনা চলত। হিন্দু পেট্রিয়ট-এ এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে লেখা হয়– অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবগুলি যে ভুমিকা পালন করে, হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'ও সেই ভুমিকা পালন করবে।

পত্রপত্রিকা প্রকাশ ঃ- ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের স্বাধীণ মতমাত জানানোর জন্য 'এনকোযাররা', 'পার্থেনন' প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ করেন। ডিরোজিওর উদ্যোগে 'ক্যালাইডোস্কোপ' পত্রিকায় ইংরেজের অত্যাচারের সমালোচনা করা হয়।

ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠির কার্যকলাপ ঃ- ডিরোজিও অনুগামী ও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠির সদস্যগণ সে সময়ের সমাজব্যবস্থাকে কুসংস্কারমুক্ত করতে গিয়ে হিন্দুসমাজের বিরাগভাজন হয়ে পবেন। এই গোষ্ঠির অনেকে ব্রাহ্মণদের সামনে গিয়ে পৈতে ছিঁড়ে ফেলতেন, কেউ বা কালিঘাটের মা কালীকে বলেতে 'Good Morning Madam'। এছাড়াও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরি প্রথার মাধ্যমে বিচার, কুলিদের বেগার খাটানো চলবে না ইত্যাদি দাবীতে সোচ্চার হন। তাঁদের বিভিন্ন কার্যকলাপ হিন্দুদের ক্ষুব্ধ করে, যার পরিণতি স্বরূপ ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বরখাস্ত করা হয়।

সমালোচনা - বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ডিরোজিওর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা নব্যবঙ্গ আন্দোলনকে বহু ইতিহাসবিদ সমালোচনা করেছেন। প্রথমত ঃ- উৎসাহের আতিশয্যে এঁরা হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যকে নগ্ন ভাষায় আক্রমণ করেন। প্রকাশ্যে পৈতে ছিঁড়ে পদদলিতে করা, গঙ্গাজলের পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা ইত্যাদি কাজ ধর্মপ্রাণ সাধারণ হিন্দুদের ব্যথিত করে। তাই নব্যবঙ্গের আদর্শ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত ঃ- এঁদের আন্দোলন ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক এবং শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ এঁদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

তৃতীয়ত ঃ নব্যবঙ্গ আন্দোলনের নেতারা প্রচলিত ব্যবস্থার সমালোচনা করলেও কোন বিকল্প সমাজব্যবস্থার কথা প্রকাশ করেননি।

চতুর্থত ঃ- এঁদের কোনো গঠনমূলক কর্মসূচী ছিল না। তাই এঁরা জনসমর্থনও পাননি।

পঞ্চমত ঃ- সাধারণ মানুষের চাহিদা বা অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে এঁরা উদাসীন ছিলেন। তাঁদের এই উদাসীনতা মানুষকে হতাশ করেছিল।

মূল্যায়ণ ঃ- উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলার সমাজজীবনে যে প্রবল ভাবাবেগ সৃষ্টি হচ্ছিল এবং সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে যে আগ্রহ জমা হচ্ছিল তারই পরিণতি এক রূপ ছিল ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন। সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শিক্ষার প্রসার, জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চার ইত্যাদি কাজে নব্যবঙ্গীয়দের অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। ইতিহাসবিদ তারাচাঁদের মতে, রক্ষনশিল হিন্দুসমাজে তাঁরা যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন, তার ফলেই চিন্তার জগতে বিপ্লব এসেছিল।

ঙ) স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য ও সীমাবদ্ধতা কী ছিল ?

উত্তর ঃ- ঐতিহাসিক সুমিত সরকার তাঁর 'The Seadeshi Movement in Bengal-1903-1908 এ বলেছেন যে, স্বদেশী যুগে যে ভাবধারা ও আদর্শবাদের উদ্ভব হয়েছিল তা ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত দেশবাসীর জীবনদারাকে প্রভাবিত করেছিল। এটি স্বদেশী যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বঙ্গবঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এই সত্যকে সামনে নিয়ে আসে যে ইংরাজ ও ভারতবাসীর স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। সুতরাং, ভারতবাসীর মঙ্গল ইংরেজদের দ্বারা হবে এ ধারণা একেবারে ভুলি। স্বরাজই হবে ভারতবাসীর একমাত্র আকাঙ্খিত দাবী। মডাররেটদের সংস্কারপন্থী দাবীতে সন্তুষ্ট না থেকে দেশবাসী স্বরাজ সাধনের দাবীতে তীব্র হয়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে গঠননমূলক স্বদেশীয় কথা বলা হয়

AMRTION

অর্থাৎ গ্রাম সংগঠন, গ্রামীন আদালত গঠন, মাতৃভাষায় জাতীয় শিক্ষা, কুটির শিল্পের প্রসার এবং বিলাতী মাল বয়কট ও স্বদেশী জিনিষের প্রতি আগ্রহ, এ সবই ভবিষ্যতের গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনের ভুমি রচনা করেছিল। সুমির সরকার বলছেন যে, গান্ধীজীর আন্দোলনের কলাকৌশলের অভিনব যেটি ছিল সেটি হল অহিংসার বাণী।

পরোক্ষ হলেও স্বদেশী আন্দোলন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার প্রভাব ফেলেছিল। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের প্রান ও অনুভব শক্তির প্রমাণ দেন। বিজ্ঞান চর্চার সাথে স্বদেশ প্রেম যুক্ত হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অগ্রণী ব্যক্তিগণ মনে করতেন যে তাদের বিজ্ঞান সাধনা বিশ্বসংস্কৃতির জগতে বাঙলার একটি চিরস্থায়ী স্থান করে দেবে। মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ এইসময়ে প্রসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণির স্বাতক হন ও পরবর্তীকালে প্রভুত খ্যাতি অর্জন করেন। শিল্প ও সংগীতের ক্ষেত্রে স্বদেশীয়ানা খুব বড় রকমের প্রভাব ফেলে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও নাটোরের মহারাজার উদ্যোগে ভারতীয় ংগীত সমাজে স্থাপিত হলে বাংলায় ধ্রুপদ সংগীতের চর্চা বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ অনুপ্রেরনা পান ওকাকুরা, নিবেদিতা এবং হ্যাভেলের কাছ থেকে। ইয়োরোপীয় শিল্প বর্জন করে তিনি ভারতীয় শৈলীতে ফিরে আসেন। ভারতের মহান শিল্প ঐতিহ্যকে সামনে তুলে এনেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রাজপুত ও মুঘল শিল্পকলা বা অজন্তায় গুহচিত্র অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীদের প্রেরনা জোগায়। ১৯০৭ সালের প্রতিষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েনটাল আর্ট;। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য তার গুরুর রীতিকে আরো সমৃদ্ধ করেন। সংক্ষেপে বলেত গেলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কোন পর্যায়েই সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এত সমৃদ্ধ ছিল না। এই সময়ে রচিত সংগীতগুলি পরবর্তীকালে আন্দোলনগুলিকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

কিন্তু স্বাদেশী আন্দোলন ধীরে ধীরে তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলে। ১৯০৯ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করা হল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অনুপ্রেরণা হয়ে রইল পরবর্তীকালের গান্ধীর আন্দোলনের জন্য। সুমিত সরকার বলছেন যে, নিশ্চিতভাবেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ব্যর্থতা ছিল সাময়িক কারণ ১৯১৮ সালের পর থেকে গান্ধিজীর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনগুলি স্বদেশী দিনের অনেক কলা, অনেক কৌশলকেই পুনর্বার ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু অন্তবর্তী বছরগুলি স্বদেশী দিনের গতি যে ক্ষীন হয়ে পড়েছিল সে কথা প্রশ্নাতীত ভাবেই সত্য। স্বদেশী আন্দোলন থিতিয়ে পড়ার পেছনে অনেকগুলি কারণকে ঐতিহাসিকরা দায়ি করেছেন। অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর Extremist Challange গ্রন্থে বলেছেন 'The movement began with a bang and ended with a whimper' পুলিশী নির্যাতনকে অবশ্যই একটি কারণ হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। বলা হয় যে, আন্দোলনকারীরা বেশিদিন পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি। সন্ত্রাসবাদীদের কঠোর হাতে দমন করা হয়। সভা সমিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা নেতাদের গ্রেপ্তার ও ফাঁসি, কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর প্রভৃতি শাস্তিদানের ফলে আন্দোলন হীনবল হয়ে পড়ে। তবে পুলিশি অত্যাচারই যে আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ সে কথ বলা যায় না। আন্দোলনের অন্তরনিহিত দুর্বলতাই আন্দোলনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছিল। মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরা বয়কটের সমর্থন করেন বটে কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীদের সহায়তা ছাড়া বিলাতী মালের বয়কট সম্ভব ছিল না। অমলেশ ত্রিপাঠী একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখিয়েছেন যে, বয়কট আন্দোলন আদপেই বিলাতী মাল আমদানীর ওপর ছাপ পেলতে পারেনি। এছাড়া বয়কট আন্দোলন সফর হবার জন্য প্রয়োজন ছিল স্বদেশীত দ্রব্যের প্রচুর্য্য।

স্বদেশী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ন সীমাবদ্ধতা হলো, আন্দোলনে ভদ্রলোক শ্রেণির প্রাধান্য কৃষকদের অর্থনৈতিকজ চাহিদার সাথে আন্দোলনকে যুক্ত করা হয়নি। কৃষকরা তাই এই আন্দোলনের সাথে তাদের যোগাযোগ খুঁজে পায়নি। মার্কসবাদীদের মতে আন্দোলনটি ছিল অনেকাংশেই এলিটিষ্ট। এছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের হিন্দু জাগরণবাদের আদর্শ মুসলমানদের ক্ষুন্ন করেছিল ও তারা আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মৌলভী আবদুল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন প্রভৃতি নেতারা যারা গোড়ায় স্বদেশী আন্দোলনে সহযোগিতা করেছিলেন তারাও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

চরমপন্থী আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের পথ ধরায় তা গণ সংযোগ হারিয়ে ফেলে। যদিও বিপ্লবীদের মধ্যে হাস, দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গের অভাব ছিল না। তবুও সন্ত্রাসবাদে ফলে ব্রিটিশ প্রশাসন কখনোই ভেঙে পড়ার মতো বড়ো বিপদে পড়েনি। চরমপন্থীরা জনতার সংগ্রামকে সংঘঠিত করার কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেনি। সংগ্রামের আন্তরিক আহ্নিকে তারা শ্রমিক চদাষী বা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেননি।নিষক্রিয় প্রতিরোধ এবং অসহযোগির আদর্শ তাঁদের কাছেও শুধুই ভাববিলাস হযেই রইল। তাঁদের নেতৃত্বেও এমন কোন সম্ভাবনাময় জাতীয় সংগঠন গড়ে উঠল না, যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাকে একটি সুনির্দিষ্ট; রূপ দেওয়া যায়। তিল প্রমুখ নেতারাও মনে করতেন যে, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি একমাত্র ধনতান্ত্রিক পথেই সম্ভব, তাদের দৃষ্টিও ধনতান্ত্রকে অতিক্রম করতে পারেনি। চরমপন্থীরা তাঁদের পূর্বসূরী মধ্যপন্থীদের চেয়ে একটি ক্ষেত্রে পশ্চাৎপর ছিলেন। এ দেশ যে বহু ধর্ম, জাতি, বহু অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত এ সত্যটি তারা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তি সুদৃঢ় হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের আন্দোলনের বাবাদর্শে ছিল উচ্চ বর্ণ এবং হিন্দুধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। সাম্প্রদায়িকতার যে বীভৎস পরিণতি পরবর্তিকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিল চরমপন্থীদের ভাবাদর্শ তার জন্য অনেকখানি দায়ী।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

লর্ড ওয়েলেসলি কীভাবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার করেছিলেন ?

উত্তর ঃ-

ভূমিকা ঃ- সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসেবে লর্ড ওয়েলেসলি তাঁর সাত বছরের শাসনকালে (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রীঃ) বেশকিছু গুরুত্বপুর্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ওয়েলেসলি মনে করতেন ভারতে সুশাসনের প্রবর্তনের জন্যই সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিস্তার ঘটানো দরকার।

সাম্রাজ্যবাদী নীতি - লর্ড ওয়েলেয়সলি সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসেব তিনটি নীতির মাধ্যমে বারতে ব্রিটটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্যোগ নেন। যেমন–১) যুদ্ধনীতি, ২) কূটনীতি, ৩) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঃ-

১। যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে - লর্ড ওয়েলসলি যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে চেয়েছিলেন। এই লক্ষ্যে তিনি টিপুর বিনাসাধনের উদ্যোগ নেন ও সফল হন।

২। কূটনীতির মাধ্যমে - ওয়েলসলি কূটনীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে (i) তাঞ্জোরের সিংহাসনের উত্তরাধিকার বিষয়ক বিরোধের সুযোগে তাঞ্জোর রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। (ii) সুরাটের নবাবের পুত্রহীন অবস্থায় মৃত্যু ঘটলে সামান্য ভাতার বিনিময়ে সুরাটের ওপর ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। (iii) কর্নাটকের নবাবের মৃত্যু ঘটলে তাঁর পুত্রের পরিবর্তে মহম্মদ আলিকে কর্ণাটকের সিংহাসনে পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখে।

৩। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির মাধ্যমে - লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তন ঘটিয়ে একে পর এক দেশীয় রাজ্য গ্রাস করেন।হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম এই নীতি মেনে নেন এবং তারপর থেকে একে একে অযোধ্যা (১৮০১ খ্রীঃ) মালব, বুন্দেলখণ্ড, উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুর প্রভৃতি রাজ্যগুলি এই নীতিতে আবদ্ধ হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। সিডনি জে আওয়েনের মতে, ওয়েলেসলি ভারতস্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেন।

AMBITION

খ) 'সম্পদ নির্গমন' কী ? এটি ভারতীয় অর্থনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল ?

উত্তর ঃ-মূলত দুটি পতে ভারতীয় সম্পদের বহির্গমন ঘটে।

১। ব্যক্তিগত বাণিজ্যনীতির মাধ্যমে- কোম্পানীর কর্মচারী ও বেসরকারি বণিকদের চরম আর্থিক লালসা বাংলার অর্থনীতিকে ভঙ্গুর করে তুলেছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার নবাব বদলের পারিতোষিক হিসেবে ইংরেজরা বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করে। এছাড়াও কোম্পানীর কর্মচারীরা ও তাদের আত্মীয়-পরিজন এদেশে অবৈধ বাণিজ্য করে বিশাল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে, এ ব্যাপারে অগ্রণি ভুমিকা নিয়েছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। ইংরেজদের বেআইনি অর্থ সংগ্রহ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস লিখেছেন, অ্যালকেমিসটদের থেকেও ধূর্ত এরা শূন্য থেকে সোনা তৈরী করতে পারত। বাংলা থেকে উপার্জিত সম্পদ ইংল্যাণ্ডে পাঠানোর জন্য বিভিন্ন পন্থা নেওয়া হয়েছিল। কেউ হিরের মাধ্যমে, কেউ বিল অব্ এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে, কেউ বা ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি কোম্পানী মারফৎ ইংল্যাণ্ডে তাদের অর্জিত সম্পদ পাঠাত।

২। কোম্পানীর বাণিজ্যনীতির মাধ্যমে -

a)। পলাশীর যুদ্ধপূর্ব অবস্থা ঃ- ইংরেজ কোম্পানীর অনুসৃত বাণিজ্যনীতিও বাংলা থেকে আর্থিক নির্গমনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। পলাশীর যুদ্ধে আগে কোম্পানী ব্রিটেন থেকে সোনা ও রূপার মুদ্রা বা বুলিয়ান আমদানি করে এদেশের পণ্য কিনত।

b) দেওয়ানী লাভের পর- ১৭৬৫-তে দেওয়ানি আদায়ের ক্ষমতা অর্জনের পর কোম্পানি বাংলার অদায়িকৃত রাজস্বে রপ্তানি উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করতে থাকে। এই পণ্য বিক্রি করে যে লাভ হয় তা জমা পড়ে ইংল্যাণ্ডের ব্যাংকে। এছাড়া কোম্পানি বিভিন্ন খাতে এদেশ থেকে প্রচুর অর্থ সম্পদ ইংল্যাণ্ডে পাঠায়। রজনী পামদত্ত বলেছেন, ভারত থেকে অপহৃত সম্পদের ভিত্তিতেই আধুনিক ইংল্যাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে।

গ) ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ কি ভারেতর 'প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' ?

উত্তর ঃ- স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকার তাঁর 'দ্যা ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেল' গ্রন্থে মহাবিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলে উল্লেখ করেছেন।

সূচনা ঃ- ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাখীনতার যুদ্ধ বলা যায় কি না তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

পক্ষে যুক্তি - জাতীয়তাবাদী নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকার পি.সি. জোশি প্রমুখ এই বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছে। ১) দেশপ্রেমিক বীর সাভারকার লিখেছেন-''মহাবিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। ২) পি.সি. জোশি তাঁর 1857 in our History প্রবন্ধে লিখেছেন–'মহাবিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। ৩) অধ্যাপক সুশোভন সরকারের মতে- 'সিপাহী বিদ্রোহকে জাতীয় সংগ্রাম না বললে ইতালির কার্বোনারী আন্দোলনকে ইতালির মুক্তিযুদ্ধ বলা যাবে না।'

বিপক্ষে যুক্তি - ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন, রমেশন্দ্র মজুমদার ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদ প্রমুখ পণ্ডিত সিপাহী বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলার পক্ষপাতি নন। ১) সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'Eighteen Fifty Seven' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা চলবে না। ২) ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের তথাকথিত প্রথম জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ, না ছিল প্রথম, না ছিল জাতীয় না ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ। তাঁর মতে, এই আন্দোলনে ভারতের সাধারণ মানুষ যোগ দেয়নি। ৩) ই.এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন, এই বিদ্রোহে যতজন সৈন্য যোগ দিয়েছিল তার থেকে অনেক বেশী সৈন্য বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল।

মন্তব্য ঃ- সবদিক বিচার করে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা যায় না। এই মহাবিদ্রোহ মূলত ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম বৃহত্তম অভ্যুত্থান।

৩। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

ক) রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭২) ?

উত্তর ঃ-

উদ্দেশ্য- ভারতে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওপর নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার জন্য ব্রিটিশ সরকার রেগুলেটিং আইন (১৭৭৩ খ্রীঃ) পাশ করে। এই আইন পাশের মাধ্যমে কোম্পানির সাংগঠনিক কিছু ত্রুটিও দূর করার চেষ্টা করা হয়।

আইনের দুটি দিক- এই আইনের দুটি দিক ছিল -১) ইংল্যাণ্ডে কোম্পানির কেন্দ্রীয় সংগঠনগত দিক এবং ২) ভারতে কোম্পানীর শাসনগত দিক। এই আনের মাধ্যমে ভারতে সর্বপ্রথম একটি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করা হয়।

শর্ত- এই আইন অনুসারে ১) বাংলা সুবার শাসনদায়িত্ব গভর্ণর জেনারেল ও চারজন সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিষদের ওপর ন্যস্ত হয়। স্থির হয়, এই চারজকন সদস্য ইংল্যাণ্ডের কোম্পানির পরিচালক গোষ্ঠি করতৃক নিযুক্ত হবেন। সাধারণবাবে শাসন ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গৃহীত হবে বলে স্থির হয়। ২) যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ওপর গর্ভনর জেনারেল ও তাঁর পরিষদের নিয়ন্ত্রন স্থাপন করা হয়। ৩) একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন সাধারণ বিচারপতি নিয়ে কলকাতায় একটি সুপ্রিমকোর্ট স্থাপন করা হয়। রেগুলেটিং আইন অনুযায়ি বাংলাত প্রথম গর্ভনর জেনারেল নিযুক্ত হন ওয়ারেন হেষ্টিংস। ৪) পরিচালক সভা কোম্পানির কাজকর্ম ও নীতি, বৈদেশিক নীতি, বাণিজ্য প্রভৃতি পরিচালনার চূড়ান্ত দায়িত্ব ভোগ করার ক্ষমতা পায়।

ত্রুটি - রেগুলেটিং আইন ত্রুটিমুক্ত ছিলনা- ১) ক্ষমতার সুনির্দিষ্টকরণের অভাবে গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে মতবেদ দেখা দেয়। ২) সুপ্রিমকোর্টের এক্তিয়ার সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভাবের জন্য দৌয বিচারালয়গুলির ওপর সুপ্রিমকোর্ট হস্তক্ষেপ শুরু করে, ফলে বিচারব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি হয়।

গুরুত্ব - ত্রুটি সত্ত্বেও রেগুলেটিং আইনের গুরত্ব অস্বীকার করা যায় না - ১) রেগুলেটিং আইন প্রবর্তনের মধ্যে দিয়েই ব্রিটিশ ভারতে এক গঠনমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ২) ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনে প্রথম লিখিত এই আইনের দ্বারাই লণ্ডনের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে কোম্পানী শাসনের ওপর নিয়ন্ত্রন আরোপের উদ্যোগ নেয়।

গ) সলবাই-এর চুক্তি ?

উত্তর ঃ- সলবাই সন্ধি স্বাক্ষরতি হয় মারাঠা নেতা নানা ফড়নবিশ এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে।

সলবাই-এর সন্ধির শর্ত ঃ- ১) ইংরেজরা সলসেট ও ব্রোচ লাভ করে। বেসিন মারাঠাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ২) দ্বিতীয় মাধর রাও পেশোয়া হিসেবে স্বীকৃতি পান। রঘুনাথ রাওকে বার্ষিক বৃত্তিদানবের ব্যবস্থা করা হয়। ৩) সিন্ধিয়া যমুনা নদীর পশ্চিম উপকূলে সমগ্র ভূখণ্ড ফিরে পান। উভয় পক্ষ যাতে সন্ধির শর্তাবলি মান্য করে, তা দেখার দায়িত্ব পান মহাদজী সিন্ধিয়া।

সলবাই-এর সন্ধির গুরুত্ব ঃ- ইতিহাসবিদ পার্সিভ্যাল স্পিয়ারের মতে, প্রথম মারাঠা যুদআদের সূচনা ছিল অনাবশ্যক এবং পরিচলনা ছিল দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এই যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১) হেষ্টিংসের মারাঠা নীতি ফলপ্রসূ হয়নি। শুধুমাত্র সলসেট ও ব্রোচ ছাড়া ইংরেজদের কিছু লাভ হয়নি। বরং যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়। এই আরআর্থিক সংকট দূর করার জন্য হেষ্টিংস বহু অবৈধ উপায় গ্রহণ করতে হয়। ২) সলবাই-এর সন্ধির ফলে পরবর্তী কুড়ি বছর ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হয়নি। এই সুযোগে ইংরেজরা ভারতের অন্যান্য শক্তিকে পরাস্ত করতে পেরেছিল। তাই লুয়ার্ড এই সন্ধিকে ইংরেজদের কূটনৈতিক জয় বলে বর্ণনা করেছেন। স্মিথও মনে করেন, সলবাই-এর সন্ধি ভারতে ব্ররিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পথ প্রশস্ত করেছিল।

AMBITION

গ) নীল বিদ্রোহের প্রকৃতি ?

উত্তর - নীল বিদ্রোহের তিনটিমূল কারণ ছিল–

নীলকরদের অত্যাচার - ব্রিটিশ কোম্পানির ১৮৭৩৩ ক্রিষ্টাব্দের সনদ আইনের সুযোগ নিযে বহু ইউরোপীয় ভারতে এসে নীলচাষের ব্যবসা শুরু করে। ক্রমে তারা নীলকর সাহেব নামে পরিচিত হয়। অনিচ্ছুক নীলচাষিদের ঘরে তারা াগুন লাগায়, কৃষিজ সরঞ্জাম লুঠ করে, এমনকি বাড়ির মেয়েদেরও সম্মানহানি করে। এসব থেকে মুক্তির লক্ষ্যে নীলচাষিরা বিদ্রোহ ঘোষনা করে।

দাদন ও দস্তুর প্রথা ঃ- নীলচাষিদের বিঘা প্রতি ২টাকা করে দাদন (অগ্রিম) দেওয়া হত। এছাড়াও নীলকুঠির কর্মচারীরা জোর করে নীলচাষিদের কাছ থেকে দস্তুরি (ঘুস) আদায় করত। এতে নীলচাষিরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহের রাস্তায় যেতে বাধ্য হয়।

পঞ্চম আইন- ব্রিটিশ সরকার ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্চম ও সপ্তম আইনে ঘোষণা করে- দাদন নিয়ে নীলচাষ না করলে তা বেআইনি হবে এবং অপরাধিকে কারাদণ্ড দেওয়া হবে। এই আইন নীলচাষীদের বাধ্য করে বিদ্রোহী করতে।

নীল বিদ্রোহের কযেকজুন নেতা - নীল বিদ্রোহের কযেকজন নেতা হলেন দিনু মণ্ডল, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস, নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়, রানাঘাটের জমিদার শ্রীগোপাল পালচৌধুরী প্রমুখ।

নীল কমিশন গঠন করেন তৎকালীন বাংলার ছোটিলাট জে.পি. গ্রানট (১৮৬০ খ্রীঃ-৩১ ডিসেম্বর)।

ঝ) সুরাট কংগ্রেস ?

উত্তর ঃ-

সূচনা ঃ- কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রথম কুড়ি বছর (১৮৮৫-১৯০৫ খ্রীঃ) কংগ্রেস ব্রিটিশের কাছে থেকে কোনো দাবিই পূরণ করতে পারেনি। এই অবস্থায় বিশেষত বঙ্গভঙ্গের সময় কংগ্রেসের ভেতরেই এক অংশের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। এই বিক্ষোভের চরম পরিণতি ঘটে ১৯০৭ খ্রীঃ সুরাট অধিবেশনে চরমপন্থী ভাঙনের মাধ্যমে।

জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশ (১৯০৭) -

পটভুমি-

১। লক্ষ্য ও পদ্ধতিগত পার্থক্য ঃ- বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে চরমপন্থীরা নিষক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে অচল করে দেবার দাবি জানান। কিন্তু নরমপন্থীদের এই দাবী মেনে নেননি।

প্রস্তাব সম্পর্কিত বিরোধ ঃ- ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসের চরমপন্থীরা চাপ সৃষ্টি করে চারটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন,, যথা-স্বরাজ, বয়ক;, স্বদেশি ও জাতী শিক্ষা। তাদের ভয় ছিল পরবর্তী সুরাট অধিবেশনে নরমপন্থীরা এই প্রস্তাবগুলি নাকচ করে দেবেন। তাই চরমপন্থীরা ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসে মঞ্চ দখল করাত পরিকল্পনা গ্রহণ করলে বিরোধ চরমে পৌঁছায়।

২। নরমপন্থী ও চরমপন্থী বিভাজন ঃ- সুরাট অধিবেশনে চরমপন্থীরা লালা লজপত রায়কে সভাপতি করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তিনি এই পদ গ্রহণে রাজি না হলে চরমপন্থীরা তিলককে সভাপতি করার দাবি তোলেন। নরমপন্থীরা বিচক্ষণতার সাথে মধ্যপপন্থী নেতা রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি মনোনিত করেন। এতে দুই দলের মধ্যে বিবাদ চরম আকার নেয় এবং তাদের মধ্যে হাতাহাতিও হয়। ফলস্বরূপ চরমপন্থীরা কংগ্রেস থেক বিতাড়িত হন। নরমপন্থী ও চরমপন্থিদের এই ভাঙন সুরাট ভাঙন নামে পরিচিত।

তাৎপর্য ঃ- সুরাট বিচ্ছেদের পে কংগ্রেসের গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসেয় জাতীয় কংগ্রেসের মর্যদা ক্ষুন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে বড়লাট মিনটো এক চিঠিতে লেখেন 'কংগ্রেসে বিচ্ছেদ আমাদের পক্ষে একটি বিরাট জয়' অবশ্য অল্পকালের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পুণরায় সংঘবদ্ধ হয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সুরাট ঘটনার ফলে জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি ও নতুন এক যুগের সূচনা ঘটে।

AMBITION

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলনপত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৪ ও জুন ২০১৫

ইতিহাস (History)

সহায়ক পাঠক্রম (Subsidiary)

S-3, SHI-III (New) : **Mordern Europe and Making of the Modern World (1789-1956)**

New Syllabus (From July 2012 Enrolment Session)

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

খ) নেপোলিয়ানের পতনের কারণ সমূহ আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য গঠনের কাজ সম্পুর্ণ হবার আগেই তার পতন সূচিত হয়েছিল। ১৮১৫ সালে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তার পতনের তিনটি সাধারণ কারণ হল-স্পেনীয় ক্ষত, পোপের প্রতি অমর্যাদাসূচক আচরণ, ও মস্কো অভিযান–নেপোলিয়ান নিজে স্বীকার করে গেছেন। নিজেকে বিপ্লবের সন্তান হিসাবে গণ্য করলেও নেপোলিয়ান সাম্রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য বা শার্লামেনের সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁর মতো একজন বিচক্ষণ ও বাস্তবাদী রাজনীতিবিদ্ বুঝতে পারেননি যে, সমগ্র ইউরোপের উপর ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা উনবিংশ শতকে একান্তই অলীক স্বপ্ন।

নেপোলিয়ানের পতনের আরেকটি কারণ হল তাঁর বহু ঘোষিত বৈপ্লবিক নীতির সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য গঠনের নীতরি স্ববিরোধীতা। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে ইউরোপে বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তার যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিল তা পরবর্তীকালে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা প্রবর্তনের ফলে ম্লান হয়।

নেপোলিয়ান সাম্রাজ্যের স্ববিরোধীতার আরেকটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর বিরোধী ভুমিক। ইউরোপে বিশেষত ইতালী ও জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার শক্তি ধ্বংস করেও প্রাশিয়াকে পরাস্ত করে এবং উভয় দেশে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ও কোড নেপোলিয়ানের মাধ্যমে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করে তিনি ওই সব অঞ্চলের সাধরণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের প্রসার তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষের জাগ্রত জাতীয়তাবাদের সাথে তার সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণার সংঘাত বাধল।

১৮০৮ সালের জুলাই মাসে নেপোলিয়ান তাঁর ভাই যোশেফকে স্পেনের রাজপদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু যোশেফের মাদ্রিদ পৌঁছানোর পূর্বেই স্পেনের গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়। স্পেনের কৃষক শ্রেণীর গেলিরা যুদ্ধের অসাধারণ প্রয়োগ, ব্রিটিশ নৌ-শক্তির সমর্থন ও রাজনৈতিক সহযোগিতা ফরাসি প্রশাসনিক কাঠামোকে উৎখাত করে। রাজা যোশেফ মাত্র এগারো দিন মাদ্রিদে অবস্থানের পর রাজধানী থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। সমগ্র স্পেনে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। বিশিষ্ট ইংরেজ বাগ্মী শেরিডন আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অভ্যুত্থানকে এক বিক্ষুব্ধ জাতীয় অভ্যুত্থান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অভ্যুত্থানের সামরিক ঘটনাবলীকে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করতে হলে পরাসি সেনাপতি মা সেনা ও শুল্টের মধ্যে নেতৃত্বের বিরোধ, ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটনের ১৮১২ সালে স্যালাম্যাংকা ও ১৮১৩ সালে ভিক্টোরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ নেপোলিয়ানের জয়ের স্বপ্নকে স্পেন ও পর্তুগাল ধুলিসাৎ করে।নেপোলিয়ান ১৮০৬ সালের ১৬ মে ব্রিটিশ অর্ডার ইন কাউন্সিলের ঘোষনা অনুসারে ব্রেস্ট বন্দর থেকে এলবা পর্যন্ত উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেলের সকল বন্দরগুলির অবরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর ১৮০৬ সালের ২৬ নভেম্বর তিনি বিখ্যাত বার্লিন ডিক্রি ঘোষনা করে সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনকে অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঘোষনা করেন, সমুদ্র পথে ফরাসি জাহাজ ব্রিটিশ নাগরিক বা ব্রিটিশ শিল্পপণ্য গ্রেপ্তার বা বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। বার্লিন ডিক্রির বিরুদ্ধে ১৮০৭ সালে ৭ জানুয়ারী এক অর্ডার ইন কাউন্সিলের মাধ্যমে ব্রিটেন সব নিরপেক্ষ দেশের ফ্রান্স অথবা তার মিত্র শক্তিবর্গের সাথে বাণিজ্যিক অবৈধ বলে ঘোষনা করে। টিলসিটের সন্ধির পর ফ্রান্সের অনুগত মিত্র হিসাবে রাশিয়া ও প্রাশিয়া ইংল্যাণ্ডের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করে।

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার সার্বিক রূপায়নে প্রধান তিনটি অন্তরায় হল–১) প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। ২) চোরাচালান বাণিজ্যের প্রকোপ বৃদ্ধি, ৩) ইউরোপীয় মহাদেশে ইংরেজ বাণিজ্য বিস্তারের ব্যাপক লাইসেন্স। নেপোলিয়ানের নৌবাহিনী, বন্দর রক্ষী বাহিনী, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন ও বাণিজ্য শুল্ক বিভাগের অধিকাংশ কর্মচারী দুর্নীতি পরায়ন হওয়ায় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভবপর ছিল না।

নেপোলিয়ানের মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮১০-১৮১১ সালে ফ্রান্সে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল তাতে শুধু বুর্জোয়া শ্রেণিই নয়, ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণিও নেপোলিয়ানের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। শ্রমিক ছাঁটাই ও বেকার সমস্যা গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। মূল হাউসে ৬০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৪০ হাজার এবং লিঁওতে ২৫ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ২০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে গিয়েছিল। ফলে মহাদেশীয় প্রথা জারি করে ইংল্যাণ্ডকে জব্দ করতে গিয়ে তিনি নিজেই জব্দ হয়ে যান।

নেপোলিয়ানের রুশ অভিযানের প্রথম সংকেত হিসাবে ১৮১১ সালের জার আলেকজাণ্ডার পোল্যাণ্ডে রুশ সেনা প্রেরণ করেন ও মিত্র সন্ধানের জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সহযোগী হিসাবে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের সহিত কূটনৈতিক আলোচনা শুরু করেন। আলেকজাণ্ডারের বিরোধী মনোভাব সংবাদ পেয়ে নেপোলিয়ান যুগপৎ ভাবে কূটনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি প্রাশিয়া থেকে ফরাসি বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র বন্ধের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৮১২ সালের ২৫ জুন ৪৫,০০০ সৈন্য সহ নেপোলিয়ান পোল্যাণ্ডের নিমের নদী অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ ভাবে রাশিয়া আক্রমনের উদ্যোগ নেন। নেপোলিয়ানের আকস্মিক রাশিয়া অভিযান সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে মারাত্মক ভুল। একশো বছর পূর্বে সুইডেনের দিগ্বিজয়ী বীর রাজা দ্বাদশ চার্লস পরাজয় বরণ করেছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান বিগত ১৫ বছরে ক্রমান্বয়ে জয়লাভণের ফলে তার মনে এমন এক আশার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সমগ্র ইউরোপে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে পরাজিত করতে পারলে তিনি পুণরায় মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে পারবেন। এমনকি ইংল্যাণ্ডকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারবেন। নেপোলিয়ান রুশ অভিযানে যে গ্রাণ্ড আর্মি গঠন করেছিলেন তার এক তৃতীয়াংশ ছিল বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ ফরাসি সেনাদল, কিন্তু রাশিয়ার প্রচণ্ড শিত এবং রুশ সেনাদের পোড়ামাটি নীতি গ্রহণের ফলে তার বিপুল সেনাদলের মধ্যে মাত্র ১,৬০,০০০ জন অবশিষ্ট থাকে। তিনি সেন্টপিটার্সবুর্গের নিকট স্মলনেট শহরে জার আলেকজাণ্ডারের সাথে যুদ্ধ

AMBITION

অথবা সন্ধির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সেনাবাহিনী নিদারুন শৈত্যপ্রবাহে ধ্বংসহয়ে ১৮১২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৩০,০০০ সেনাসহ রুশ সীমান্ত অতিক্রম করে।

নেপোলিয়ান তখনও তার আত্মবিশ্বাস হারায়ননি। তিনি ফ্রান্স ও তার অনুগত রাজ্যগুলি থেকে পুণরায় ৫লক্ষ সৈন্য সমবেত করেন। অস্ট্রিয়ার সাথে তার চুক্তি ও রাইন রাজ্যসংঘ ও ইতালীর সাথে তার সম্পর্ক অটিট থাকার ফলে তিনি তখনও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ফরাসি শোষন ও তার বিরুদ্ধে এক প্রবল গণপ্রতিক্রিয়া ইউরোপীয় রাজনীতিতে নেপোলিয়ানের আধিপত্য শিথিল করে। নেপোলিয়ানের অনুগত রাজ্যগুলিকে শুধু যুদ্ধের সময় নয় শান্তির সময়েও প্রচুর অর্থ প্রদান করতে হতো। ইউরোপীয় কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেপোলিয়ানকে ওয়েস্ট ফেলিয়ার রাজ্য ছাব্বিশ মিলিয়ন ফ্রাঁ কর দিত। তার মধ্যে দশ মিলিয়ন ফ্রাঁ সেনাদের ব্যায় নিবাহের জন্য দিত। নেপোলিয়ান ফরাসি সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪৪ মিলিয়ন কর দিত। ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণবিস্ফোরণ শুধু স্বাদেশিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়নি। তার সাথে যুক্ত হয়েছিল বিদেশী শাসন ও শোষণের অসহনীয় মাত্রা।

নেপোলিযানের শেষ সামরিক অভিযান শুরু হয় ১৮১৪ সালের ১৪ জুন। মাত্র ১২,০০০ সেনা সহ বেলজিয়াম সীমান্তে ইংরেজ প্রাশিয়ান সেনাবাহিনীকে পৃথক পৃথক ভাবে আক্রমণ করে পরাজিত করার যে পরিকল্পনা নেপোলিয়ান করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের নিপুন সেনা পরিচালনা ও সংকট মুহুর্তে প্রাশিয়ান সেনাপতি ব্লুকারের সাহায্য ব্যর্থ করে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পরাজয় তাঁর পতনকে অবশ্যাম্ভাবী করে তোলে। ইংরেজ সেনাবাহিনী আটলান্টিক মহাসাগরে দুর্গম সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তাকে নির্বাসন করে। ১৮২১ সালে নেপোলিয়ানের মৃত্যু হয়।

ঙ) ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান ব্যাখ্যা করুন ?

উত্তর ঃ- ইতালীর দুঃসময়ে প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী বেনিটো মুসোলিনীর আবির্ভাব হয়। বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীতে যেসব বিপ্লবী সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে বেনিটো মুসোলিনীর প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট বা ফ্যাসিবাদী দল উল্লেখযোগ্য।

মুসোলিনীর প্রথম জীবন ঃ — ১৮৮৩ খ্রীঃ মুসোলিনী উত্তর ইতালীর এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন একজন স্কুলের শিক্ষায়ত্রী এবং ১৮ বছর বয়সে মুসোলিনী একজন স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে সুইজারল্যান্ডের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে কলকারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটে প্ররোচিত করায় তাঁকে সুইজারল্যান্ড থেকে বহিস্কার করা হয়।

ফ্যাসিবাদী দলের প্রতিষ্ঠা ঃ — স্বদেশে ফিরে এসে মুসোলিনী ১৯১৯ - এ কিছু যুদ্ধ ফেরত সৈনিক ও বেকারদের নিয়ে ফ্যাসিবাদী দল গঠন করেন। এর প্রতীক ছিল ফ্যাসেস বা এক আঁটি শলাকা। প্রাচীন রোমের কন্সালগণ এই জাতীয় জিনিস ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাঁর দলের প্রকৃত নাম ছিল ফ্যাসি-ডি-কম্বটিমেন্টো।

জনচিত্ত জয়ের চেষ্টা ঃ — মুসোলিনী ঘোষণা করেন যে, কাজের সময় ৮ ঘন্টার বেশী করা চলবে না। কিছু কলকারখানা পরিচালনা করবে শ্রমিকগণ, কিছু গীর্জ্জার ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা দরকার। বিত্তবানদের উপর কর এবং কিউমও ডালমাসিয়া দখল করা জরুরী বলে বলেন। তাঁর এই সকল দাবী জনচিত্ত জয় করে।

ব্ল্যাক সার্ট গঠন ঃ — মুসোলিনী প্রাক্তন সৈনিক ও বেকারদের নিয়ে একটি আধা সামরিক বাহিনী তৈরী করেন। এর সদস্যরা কালো জামা পরত বলে তাদের বলা হত ব্ল্যাক সার্ট।

ক্ষমতা দখল ঃ — ১৯২২ - এ মুসোলিনী আধা সামরিক বাহিনী রোম অভিযান পরিচালনা করে। ইতালীর নিয়মতান্ত্রিক রাজা ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল সেটি প্রতিহত করার অনুতম তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে না দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেন। তখন রাজার আমতন্ত্রে মুসোলিনী ১৯২২ খ্রীঃ ৩০ শে অক্টোবর মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এহভাবে ইতালীতে ফ্যাসিস্ট দল ক্ষমতাসীন হয়।

ফ্যাসিবাদ ঃ — ইতালীতে ক্ষমতা দখল করার পর মুসোলিনী তাঁর দলের রাজনৈতিক দর্শন গড়ে তোলেন যেটি ফ্যাসিবাদ নামে পরিচিত। মুসোলিনী দাবী করেন যে, ফ্যাসিবাদ হল বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার মানদন্ড। রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে ফ্যাসিবাদের মূলমন্ত্র ছিল ঃ ''রাষ্ট্রই সকল শক্তির আধার, রাষ্ট্রের বাইরে কিছু নেই এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ও কিছু নেই। সবই রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত।'' এই রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী সেটি জনগণের সমগ্র জীবনের নিয়ন্ত্রক, ব্যক্তির রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য একযোগে কাজ করে যাবে। ফ্যাসিবাদ একনায়কতন্ত্র ও বীর পূজোয় বিশ্বাস। এটি গণতন্ত্র ও ব্যক্তিসাম্যের ও স্বাধীনতার বিরোধী। এই মতবাদ অনুযায়ী ইতালীর একনায়ক মুসোলিনী অভ্রান্ত। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে কোনো বিরোধী দল থাকবে না। মুসোলিনী ফ্যাসিবাদী আন্দোলনকে ''দলবিহীন একটি জাতীয় আন্দোলন'' বলে অভিহিত করেন। ফ্যাসিবাদে গণ সার্বভৌমত্বের কোনো স্থান নেই।

ফ্যাসিবাদের শ্লোগান — 'এক জাতি এক রাষ্ট্র, এক দল ও এক নেতা'। এই মতবাদ যুদ্ধের সাহায্যে রাজ্য সীমা সম্প্রসারণে বিশ্বাসী। এটি যুদ্ধ চায়, শান্তি নয়।ফ্যাসিবাদের লক্ষ্য ঃ — ফ্যাসিবাদের মূল চারটি মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল। যথা – (১) রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করা ; (২) ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি রক্ষা করা ; (৩) ইতালীকে বিশ্ব রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য উপযুক্ত বিদেশনীতি অনুসরণ করা এবং সাম্যবাদের প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত রাখা।মল্যায়ন ঃ — এই মতবাদের মূলকথা ছিল রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি, ইতালীর হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার, বলিষ্ঠ বিদেশনীতি অনুসরণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা এবং সাম্যবাদের উচ্ছেদ সাধন। প্রাথমিক ক্ষেত্রে মুসোলিনী চতুরভাবে ইতালীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের বিরোধীতা করলেও পরে তিনি তা সমর্থন করেন। তৎকালীন ইউরোপ ও বিশ্বের দরবারে ইতালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

ছ) ভার্সাই চুক্তি কি একটি জবরদস্তিমূলক চুক্তি ?

উত্তর ঃ ভার্সাই সন্ধি কি জার্মানীর পক্ষে একটি জবরদস্তিমূলক সন্ধি ? আলোচনা করুন। উত্তর ঃ— জার্মানীর সঙ্গে সম্পাদিত ভার্সাই সন্ধি বিশ্বের কূটনৈতিক ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯১৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে পরাজিত জার্মানী আত্মসমর্পণ করায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। যুদ্ধ শেষে মিত্রপক্ষ ও সহযোগী ৩২ টি দেশের প্রতিনিধিরা প্যারিসের সম্মেলনে যোগ দিলেও প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন ৪ জন বা 'BIG FOUR'। এঁরা হলেন —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেসোঁ এবং ইতালীর প্রধানমন্ত্রী অর্ল্যান্ডো।ভার্সাই সন্ধি ঃ — দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯১৯ খ্রীঃ ২৮ শে জুন মিত্রপক্ষ জার্মানীর সঙ্গে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করে। ১৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত ৪৩৯ টি ধারা নিয়ে এই সন্ধি রচিত। এই সন্ধির প্রথম অংশে ছিল জাতিসঙ্ঘের সনদ, পরে ছিল অন্যান্য শর্তাবলী।জার্মানীর প্রতি দুর্ব্যবহার ঃ — বিজয়ী মিত্র শক্তির মতে জার্মানী ছিল যুদ্ধ অপরাধী। তাই তাকে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে কোন সুযোগ না দিয়ে একতরফাভাবে সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়।ভৌমিক / ভৌগোলিক শর্তাদি ঃ — ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্মানীকে বহু অঞ্চল হারাতে হয়। যেমন ঃ —(১) ফ্রান্সকে আলসাস, লোরেন্স ; (২) বেলজিয়ামকে ইউ পেন, মালমেডি, ও মরেসনেট ; (৩) পোল্যান্ডকে পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়ার অধিকাংশ অংশ, পরে উত্তর সাইলেসিয়া ও পোল্যান্ডকে দেওয়া হয়;(৪) বাল্টিক সাগরের তীরে ডানজিগ ওমেমেলা বন্দর দুটি জার্মানীর হাতছাড়া হয়; (৫) জার্মানীর সমৃদ্ধ সার অঞ্চল ১৫ বছরের জন্য ফ্রান্সকে দেওয়া হয়; (৬) উত্তর স্লেজউইগ ডেনমার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এরফলে ইউরোপের বহু ভূ-খন্ড থেকে এমনকি বহু ঔপনিবেশ থেকেও বঞ্চিত হয়।ঔপনিবেশিক শর্তাবলী ঃ — ইউরোপের বাইরে উপনিবেশ থেকে জার্মানীকে বঞ্চিত করা হয়। আইনত জাতিসঙ্ঘ এই উপনিবেশগুলির দায়িত্বগ্রহণ করলে ও বাস্তবে ইংল্যান্ড,ফ্রান্স, জাপান, বেলজিয়াম, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের মধ্যে তা ভাগ করে দেওয়া হয়।সামরিক শর্তাদি ঃ — সামরিক দিক থেকে

AMBITION

ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে প্রায় সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করা হয় । (১) জার্মানীর সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করে ১ লক্ষ সৈন্য রাখার অধিকার দেওয়া হয়; (২) বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয় । (৩) জার্মানীর যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ, জঙ্গী বিমান প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয় । যুদ্ধজাহাজগুলি ইংল্যান্ডকে দিয়ে দেওয়া হয়;(৪) হেলিগোল্যান্ডে জার্মান দুর্গগুলি ভেঙে ফেলা হয়; (৫) জার্মানীর মধ্যে জার্মানীর খরচে মিত্র সৈন্যবাহিনী রাখা হয় ।

অর্থনৈতিক শর্তাদি ঃ — অর্থনৈতিক শর্তাদির দ্বারা জার্মানীকে একেবারে পঙ্গু করে দেওয়া হয়; (১) যুদ্ধের জন্য জার্মানীকে দায়ী করে মিত্রপক্ষ জার্মানীকে ব্যাপক অঙ্কের ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেয়; (২) ফ্রান্সের খনিজ সম্পদ ধ্বংস করার ক্ষতিপূরণ হিসাবে সার অঞ্চল ১৫ বছরের জন্য ফ্রান্সকে দেওয়া হয়; (৩) ইতালী ও বেলজিয়ামকে ১০ বছরের জন্য প্রচুর কয়লা জার্মানীকে দিতে বাধ্য করা হয়; (৪) মিত্রপক্ষকে জার্মানী বহুসংখ্যক রেলইঞ্জিন ও মোটরগাড়ী সরবরাহ করতে বাধ্য করা হয় ; (৫) জার্মানীর বড় বড় বানিজ্য জাহাজগুলি ফ্রান্সকে দিতে বাধ্য করা হয়; (৬) অন্যান্য দেশে জার্মানীর বিশেষ বাণিজ্যিক অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় ।

অন্যান্য শর্তসমূহ ঃ — (১) জার্মান সম্রাট কাইজার ও দ্বার সেনাপতিদের যুদ্ধ অপরাধী ঘোষণা করা হয়; (২) ভার্সাই সন্ধির প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয় যে, শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি এবং বিশ্বশান্তিরক্ষার জন্য জাতিসঙ্ঘ স্থাপন করা হবে । এজন্য একটি আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করা হবে । এছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন স্থাপন করা হবে ।

সমালোচনা ঃ — সমকালে ও পরবর্তীকালে ভার্সাই সন্ধির মূল্যায়ন নিয়ে রাষ্ট্রনায়ক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বহু বিতর্ক হয়েছে । বিভিন্ন দিক থেকে এই সন্ধির সমালোচনা করা হয়েছে ।

একতরফা সন্ধি ঃ — জার্মান জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা ভার্সাই সন্ধিকে একটি 'জবরদস্তীমূলক সন্ধি' বা 'Dictated Peace' বলে অভিহিত করেন । শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী জার্মান প্রতিনিধিদের সন্ধির শর্ত আলোচনার অধিকার না দিয়ে একতরফাভাবে জার্মানীর উপর এই সন্ধি চাপিয়ে দেওয়া হয় ।ন্যায়নীতির অভাব ঃ — এই সন্ধির পশ্চাতে ন্যায়নীতি ও পারস্পরিক সুবিধা নীতি একেবারেই ছিল না ।প্রতিশোধ নীতি ঃ — জার্মানীর ন্যায় এক বৃহৎ রাষ্ট্রকে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা যেরূপভাবে অসামরিকীকরণ উপনিবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তা ইতিহাসে বিরল । মিত্রশক্তি তাদের উপনিবেশগুলি অক্ষুন্ন রেখে জার্মানীর উপনিবেশগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে । লীগের বেইমানিতে বিজয়ী শক্তিগুলি সেই উপনিবেশ দখল করে ।

চতুর্থদফা ভঙ্গ ঃ — জার্মানীকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, চতুর্দশ দফা মেনে অস্ত্র সমর্পণ করলে এই ১৪ দফার ভিত্তিতে এই শান্তি চুক্তি রক্ষিত হবে । কিন্তু ভার্সাই সন্ধিতে চতুর্দশ দফাকে অগ্রাহ্য করা হয় । জার্মানীর মতে এটা ছিল তার প্রতি প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা ।জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রতি অবিচার ঃ — 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' — এই নীতিই ছিল ভার্সাই ও অন্যান্য শান্তিচুক্তিগুলির মূলসূত্র । কিন্তু জার্মানীকে এই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা ছিল জার্মান জাতীয়তাবাদের অবমাননা ।

ল্যাংসামের সমালোচনা ঃ — ল্যাংসামের মতে ঃ (১) জার্মানীর নৌ-শক্তি খর্ব করার জন্য জার্মান যুদ্ধ জাহাজগুলি ইংল্যান্ডকে দেওয়া হয়েছিল । ফলে ইংল্যান্ডের জাহাজ নির্মাণ শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অপরদিকে জার্মান জাহাজ শিল্পে তেজীভাব দেখা যায়; (২) ভার্সাই সন্ধির ভৌমিক শর্তাদির দ্বারা মধ্য ইউরোপকে ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় । যা ভবিষ্যতে জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে গ্রাস করা সহজ হয় ।

মূল্যায়ন ঃ — ভার্সাই সন্ধির সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন মন্তব্য করেছেন যে , এই সন্ধিটি ছিল — ''ভুল জায়গায় নিদারুন কঠিন এবং ভুল স্থানে উদারপন্থী ।'' সন্ধি রচনার সময় মিত্রশক্তি অহেতুক কঠোরতা দেখান এবং সন্ধি রক্ষার সময় অনাবশ্যক দুর্বলতা, বা উদারতা দেখান । যদি জার্মানীর উপর ন্যায্য আচরণ ও শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি স্থাপন করা হত । তবে জার্মানী এই সন্ধি মানতে নৈতিক বাধ্যবাধকতা স্বীকার করত । তাহলে এই সন্ধি ২০ বছরের মধ্যে এত সহজে ভেঙে পড়ত না । ভার্সাই সন্ধির মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যত বীজ নিহিত ছিল ।

জ) চীনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে (১৯৩৭-'৪৫) সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন ?

উত্তর ঃ-ভূমিকা ঃ — ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মাও সে তুঙ তাঁর বিখ্যাত তাত্ত্বিক প্রবন্ধ 'On New Democracy' রচনা করেছিলেন । এই প্রবন্ধে মাও সে তুঙের চীনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব গভীর ও নিপুণভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর সিদ্ধান্তগুলি ছিল এই যে, চীন হল একটি আধা উপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক দেশ । এখানে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক তাদের সহযোগী শক্তিগুলি হল জনসাধারণের শত্রু । তাই শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মতো কেবল শ্রমিক শ্রেণীর অংশ গ্রহণে বিপ্লবকে সফল করতে পারেন ।বিপ্লব সম্পর্কে মাও সে তুঙের বক্তব্য ঃ — বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী যেমন শ্রমিক শ্রেণী দারিদ্র্য ও মধ্যবিত্ত কৃষকশ্রেমী বুদ্ধিজীবি শ্রেণী ও পেটি বুর্জোয়া এবং জাতীয় পুঁজিপতির শ্রেণী ঐক্যবদ্ধভাবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তুলে বিপ্লব সফল করবে । এরফলে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হবে । সেই ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠবে নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা । যেখানে পুঁজিপতির শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ থাকবে না । বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সোভিয়েত গণতন্ত্র উভয়ের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এই গণতন্ত্র । কারণ এখানে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকবে না, আবার সর্বহারা একনায়কত্বের পরিবর্তনে এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিক,কৃষক,বুদ্ধিজীবি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র । এইভাবে মাও বিপ্লবের পরবর্তী স্তরে মার্কসবাদ ও লেলিনবাদের আদর্শে কিভাবে চীনে একটি নতুন সমাজ গড়ে উঠবে তার একটি রূপরেখা অঙ্কন করেছেন ।

সি.সি.পি. - র কার্যকলাপ ঃ — ১৯৩৭ — ৪৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইয়েনানকে কেন্দ্র করে সি.সি.পি. একদিকে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল । একদিকে একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল ইয়েনান । ইয়েনান ছিল কৃষকদের কর্মকান্ডের প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র । সাহাই ছিল চীনের শ্রমিক আন্দোলনের প্রানকেন্দ্র । জাঁ শোনো বলেছেন যে, ইয়েনান ছিল একটি স্নায়ুকেন্দ্র যা একটি অসম্ভব সফল সামরিক সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, আবার এটি ছিল নতুন সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কের প্রতীকি একটি মডেল ।

মাও - এর কার্যকলাপ ঃ — মাও যুদ্ধকালীন অবস্থার সুযোগ নিয়ে সাম্যবাদী দল ও সাম্যবাদী সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করে এবং জনগণকে সাম্যবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত করে । সাম্যবাদী বিপ্লবের জন্য সংগঠিত করেন । চীনের কৃষিভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি মার্কসবাদ ও লেলিনবাদ প্রচারে তৎপর হন । তাঁর বিশেষ কার্যক্রম ছিল গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা । মাও বিশ্বাস করতেন যে, সকল শ্রেণী চীনা অধিবাসী নতুন চীন গঠনে এগিয়ে আসবে । এইসময় মাও-এর ৬টি প্রধান লিপি ছিল খন্ডিত । সেনা দল গঠন এবং সরল প্রশাসন, গ্রামমুখী অভিযান, যাতে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় আর দলীয় ক্যাডাররা কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে একজোটে সাম্যবাদী আন্দোলনে সামিল হতে পারে । যেসব অঞ্চলে ভূমিসংক্রান্ত কোনো সংস্কারকার্য হয়নি সেই অঞ্চলে খাজনা ও সুদের হার ২৫ — ৪০ শতাংশ হ্রাস, গ্রামীন অর্থনীতি পুর্নগঠনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সমবায় আন্দোলন প্রবর্তন,সাংগঠনিক অর্থনীতি প্রবর্তন যাতে প্রতিটি সংগঠনও ক্যাডার কায়িক এবং তত্ত্বাবধায়কভাবে অংশগ্রহন করতে পারে, গ্রামীন অঞ্চলসমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক রূপান্তরের জন্য এক নতুন শিক্ষা আন্দোলন মাও প্রবর্তন করেছিলেন । কৃষকদের জাতীয় সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা ঃ — ১৯৩০ -এর দশকের গোড়ার দিকে চীনা -সোভিয়েত অঞ্চলগুলিতে ভূস্বামীদের জমি ক্রোক করে সেগুলি ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল । কিন্তু গণতান্ত্রিক ঘাঁটীগুলিতে যদি ক্রোক না করে কৃষকদের ওপর থেকে খাজনার পরিমাণ প্রায় ২৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছিল । মহাজনদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে কৃষকদের দেওয়া সুদের পরিমাণও অনেকটাই কমানো হয়েছিল । যে সমস্ত কৃষক ঋণ নিয়েছিল তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । এরফলে কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় । উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম ঃ — যখন জাপানী সৈন্য ও ড.ণ.ফ. বাহিনী

AMRITON

মুক্তাঞ্চলগুলি ঘিরে ফেলেছিল, তখন সেখানকার সরবরাহ পথগুলি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এবং সেখানকার জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সি.সি.পি.-র বাস্তব ব্যবস্থা হিসেবে সৈন্য থেকে আরম্ভ করে কৃষক পর্যন্ত সকলকে উৎপাদন করার নির্দেশ দেন।

নারী প্রগতির সূচনা ঃ — ইয়েনানের মুক্তাঞ্চলে নারীরা প্রশংসনীয়ভাবে বিভিন্ন কাজে যুক্ত হওয়ার প্রয়াস দেখিয়ে প্রগতির সামিল হয়েছিলেন। সৈন্যদের দেখাশোনা করা, কৃষিকাজে সাহায্য করা, শিল্প সমবায়ে কাজ করা, কুটীর শিল্পে নিযুক্ত থাকা প্রভৃতি কাজে গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকার মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইয়েনান সংস্কৃতি ঃ — সি.সি.পি. ইয়েনানে ঘাঁটি তৈরী করার পর ইয়েনান সাম্যবাদ গড়ে তুলেছিল যা রাশিয়ার পছন্দ ছিল না। ফলে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু পশ্চিমের বেশ কিছু কমিউনিস্ট ব্যক্তিগত উদ্যোগে চীনে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডাঃ নরম্যান বেথুম। ভিয়েতনাম, কোরিয়া, ও জাপানের কমিউনিস্টরা। সেইসময় ইয়েনানে এসেছিলেন — হো চি মিন ও নো সাকা সাঙ্গো। বিভিন্ন শহরের বুদ্ধিজীবিরা মক্তাঞ্চলের গ্রামগুলিতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে সি.সি.পি. আয়োজিত শিল্পী সাহিত্যিকদের একটি ফোরামের সামনে মাও শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবিদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বর্জন করে জনগণের অবস্থান নিয়ে তাদের জন্য সৃজনশীল কাজ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

ঝ) নব্য-উপনিবেশবাদের প্রসারকে ব্যাখ্যা করুন ?

উত্তর ঃ- দ্বিতী বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে একটি শ্বেত পত্রের দ্বারা ব্রিটেন প্যালেস্টাইনে ইহুদী অনুপ্রবেশ সীমিত করেছিল, কিন্তু এরফলে প্যালেস্টাইনে একটি নিজস্ব বাসভূমি অর্জন করার স্বপ্ন বিফল হতে বসেছিল। ফলে ইহুদীরা বে-আইনি অনুপ্রবেশ করতে লাগল, এবং এরজন্য ম্যানডেট কর্তৃপক্ষের সাথে তারা যুদ্ধে যেতেও প্রস্তুত ছিল। এতদিন পর্যন্ত ব্রিটেনের সমর্থনে জায়নিষ্টরা প্যালেস্টাইনে নিজেদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছিল। ১৯৩৫ সালে মনে হল যে বৃটেন হয়ত বিভাজনের প্রস্তাবে রাজী হলেও হতে পারে। কিন্তু১৯৩৯ সালে ব্রিটেন ও ইহুদীরা উভয়েই যখন ন্যাৎসী জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হল তখন ইহুদীরা উপলব্ধি করল যে এখন জার্মানীকে পরাস্ত করাই একমাত্র লক্ষ্য।

যুদ্ধের বিভীষিকা শেষ হলে পর ইহুদীরা সমগ্র বিশ্বের কাছে সফলভাবে তাদের দাবী পেশ করতে পারবে, তখন নিশ্চই ম্যানডেটের অবসান ঘটবে এবং তাদের স্বপ্ন পূরণ হবে। এমনিতেই ইহুদীরা ইতিমধ্যেই প্যালেস্টাইনে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল কাজেই প্যালেস্টাইনকে নিজ ভূমিতে পরিণত করার উচ্চাকাঙ্খার মধ্যে অস্বাভাবিকতা ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীরা দোটানায় পড়েছিল। ইহুদী নেতা 'বেন গুড়িয়েণ' মন্তব্য করেছিলেন যে, এমনভাবে ইহুদীদের সংগ্রাম করতে হবে যেন হিটলার বা বৃটিশ ম্যানডেট কারো কোনো অস্তিত্ব না থাকে। কিন্তু বাস্তবে এই নীতি কার্যকরী করা অসম্ভব ছিল। প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সংগঠিত গোষ্ঠী ছিল 'হাগানা', তারা বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতার নীতিগ্রহণ করেছিল।

অন্যদিকে বৃটেন দোটানায় ছিল এই চিন্তায় ইহুদী না আরব কার সঙ্গে মৈত্রী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বেশী লাভজনক হবে। ১৯৪৩ সালে যখন 'ওল আলামেন' ও 'স্ট্যালিন গ্রাদের' বিজয় যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করেছিল। অক্ষশক্তির বিজয় রথ থামিয়ে দিয়েছিল, তখন ইহুদীরা তাদের দোটানার অবসান করেছিল। অন্যদিকে জার্মানীতে হিটলার ইহুদীদের ওপর এমন নৃশংস অত্যাচার চালাতে শুরু করলেন যে মনে হল সমগ্র ইহুদী জাতটাকে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। ফলে হাগানা আরোও দৃঢ়ভাবে ইহুদীদের সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে লাগল। এ ব্যাপারে বৃটেনকে তারা কোন গুরুত্ব দিতে রাজী হল না।

কিন্তু চার্চিলের সহানুভূতির ফলে বৃটেন ইহুদীদের সাথে বিরোধে না জড়িয়ে একটি ইহুদী সেনাদল গঠন করল। যারা ইতালীতে নিজস্ব পতাকা তলে যুদ্ধ করল, যে পতাকা পরবর্তীকালে ইজরায়েলের পতাকায় পরিণত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ইহুদী সংগঠন আরো শক্তিশালী হল। কারণ — ১৯৪০ সাল থেকে আমেরিকাতে বিভিন্ন ইহুদী সংগঠনগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৪২ সালের মে মাসে নিউইয়র্কের 'বিলটমোর' হোটেলে 'American Zionist Emergency Coucil'(AZEC) বেন গুড়িয়েণের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নিল যে প্যালেস্টাইনে ইহুদী অনুপ্রবেশ অবাধ করতে হবে এবং ইহুদী কমনওয়েলথ ও নতুন গণতান্ত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত একটি দেশ। ক্রমশঃAZEC একটি জঙ্গী সংগঠনে পরিণত হল। কাজেই যুদ্ধ শেষে এর অবস্থান হয়েছিল অত্যন্ত দৃঢ়ভিত্তিক। তারা একটি সরকার ও সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এভাবে সামরিক শক্তি অর্জন করে ইহুদীরা এক সামরিক জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বৃটেনে প্যালেস্টাইনের ওপর থেকে ম্যানডেট প্রত্যাহার করে নিল। এরপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে প্যালেস্টাইনকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়। একটি হল ইহুদী অধ্যুষিত রাষ্ট্র এবং অন্যটি হল আরব জাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র। কিন্তু আরব জাতি এই সমাধান সূত্র মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালের ১০ই মে বৃটেন আনুষ্ঠানিকভাবে প্যালেস্টাইনে তার ম্যানডেট ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিল। এর সূত্র ধরে ইহুদীরা তাদের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করল। কিন্তু মিশর, জর্ডন, সিরিয়া, লেবানন ও সৌদি আরব নিয়ে গঠিত আরব লীগ নতুন ইজরায়েল রাষ্ট্রকে যৌথভাবে আক্রমণ করল। কিন্তু আরব সঙ্ঘ ক্ষুদ্র ইজরায়েল বাহিনীর কাছে পরাস্ত হল। শক্তির লড়াইয়ে জয়লাভ করে ইজরায়েলের দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হল এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইজরায়েল এক উল্লেখযোগ্য শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হল।

ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মধ্যপ্রাচ্যে তার গভীর প্রভাব পড়েছিল। এখান থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তৈল সরবরাহ বজায় রাখা বৃটেনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী ছিল। ফ্রান্সের পতন হলে জার্মানির পক্ষে বলকান ও ভূমধ্যসাগরের দিকে নজর দেওয়াতে আর কোনো বাধা রইল না। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের দিক দিয়ে দেখলে তত বিপদের কোনো আশঙ্কা ছিল না। কারণ, সেখানে জার্মানি ও ইতালির সাফল্য সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা হয়েছিল। পারস্যের শাহ্ জার্মানীর সাফল্যের উদাহরণে উৎসাহিত হয়েছিল। জেরুজালেমের মুফতি ইতালির সঙ্গে চুক্তি করার জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ইহুদীদের পক্ষে হিটলারের সঙ্গে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই ইতালি বা জার্মানীর পক্ষে সহানুভূতি সম্পন্ন জনসাধারণের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত খুব বেশী ছিল না।

৩) যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

ঘ) তৃতীয় নেপোলিয়ানের আভ্যন্তরীণ নীতি ?

উত্তর ঃ- প্রথম নেপোলিয়ানের মতোই তৃতীয় নেপোলিয়ানও একটি কঠোর কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর সর্বোচ্চ ক্ষমতা রেখেছিলেন নিজের হাতে। অবশ্য একটি সেনেট ও দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা ছিল। আইনসভার ওপরের কক্ষকে বলা হত 'কাউন্সিল অব্ স্টেট', নিম্নকক্ষকে বলা হত আইন পরিষদ, তার সদস্যসংখ্যা ২৬০। আইনসভার ক্ষমতা ছিল সামান্য। সংবিধানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছিল সেনেট। মন্ত্রী পরিষদ কিন্তু আইনসভা বা সেনেটের কাছে দায়বদ্ধ ছিল না। তাঁরা সম্রাটের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। তাদের অধীনে 'প্রিফেক্ট' পদবাচ্য আমলারা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে, কমিউক ও পৌরসভায় সম্রাটের নির্দেশ বলবৎ করত। তৃতীয় নেপোলিয়ান সেনাদের পদোন্নতির প্রচুর সুযোগ দিয়ে, তাদের বেশী মর্যাদা বেতন দিয়ে অনুগত করে রেখেছিলেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চকেও তৃতীয় নেপোলিয়ান নানাভাবে তুষ্ঠ করেছিলেন। তাঁর আমলে যাজকদের অর্থ ও প্রতিপত্তি দুই-ই বেড়েছিল। আর বেবেছিল রাজধানীর জমক।

তবে তৃতীয় নেপোলিয়ানের আভ্যনন্তরীন নীতি উদ্দেশ্যহীন ছিল না। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব ফরাসি নাগরিক জীবনে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিল, তার অবসান ঘটানো ছিল তাঁর লক্ষ্য। ফ্রান্স তখনো প্রধাণত কৃষির ওপর দাঁড়িয়ে। তৃতীয় নেপোলিয়ান তাই কৃষকদের দিকে নজর দিয়েছিলেন। সরকারের তরফে ঢালাও কৃষি ঋণ আর অল্প সুদের বিধান দিয়ে তিনি ক্ষুদ্র জমনির মালিকদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

শিল্প থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেননি তৃতীয় নেপোলিয়ান। শিল্পের প্রয়োজনে পরিবহনের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন তিনি। ১৮৫৯ থেকে ১৮৭০ এর মধ্যে ফ্রান্সের রেলপথের বিস্তার জার্মানী ও ব্রিটেনের সাথে তুলনীয় ছিল। রেলপথের প্রসারের সাথে সাথেই কয়লা শিল্প ও

AMBITION

ধাতুশিল্পের বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটেছিল।

আলফ্রেড কোবান মনে করেন, তৃতীয় নেপোলিয়ানের আমলে ফ্রান্সে ঋণব্যবস্থার সার্থক ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যকে তাই ব্যাংকিং-এর স্বর্ণযুগও বলা চলে।

ঝ) ১৯২৯-এর মহামন্দা ?

উত্তর ঃ- ভূমিকা ঃ — প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পে বিশ্বকূটনীতিবিদরা যে মুহূর্তে ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে শান্তি ও স্থায়িত্বের সম্পর্ক বিলীন করে দিয়ে যে আঘাতটি যুদ্ধোত্তর ইউরোপ তথা বিশ্বকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল তা 'The Great Depression' বা 'মহামন্দা' নামে পরিচিত। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এক অভাবিত ও মারাত্মক আকস্মিকতায় এই আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। ১৯২৯ খ্রিঃ ২৪ শে অক্টোবর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক দুনিয়ায় 'কালো বৃহস্পতিবার' নামে চিহ্নিত হয়।

মহামন্দার উদ্ভব ও প্রকৃতি ঃ — অর্থনৈতিক মহামন্দার কারণ জটিল হলেও অজানা নয়। ইউরোপীয় অর্থনীতিতে মন্দা অভিনব বিষয় নয়। বরং যুদ্ধের পূর্বেই ইউরোপের বিভিন্ন পর্বে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রায়ই অর্থনৈতিক আবর্তের স্বীকার হয়। এই সঙ্কটের মূল বহু বছর যাবৎ ধীরে ধীরে ইউরোপীয় অর্থনীতির গভীরে প্রথিত হয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, বহির্বাণিজ্য শিল্পায়নে যন্ত্রের ব্যবহার প্রভৃতি এই সমস্যাকে আরও জটিল থেকে জটিলতর করেছিল। এগুলি সবই ছিল যুদ্ধের পূর্বের সৃষ্টি। যুদ্ধের দ্বারা পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মহামন্দার যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে —বাণিজ্যিক সঙ্কট ঃ — ইউরোপীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল বর্হিবাণিজ্য। এই বর্হিবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে যুদ্ধের পর তীব্র সঙ্কট দেখা দেয়। এই সঙ্কটের মূলে ছিল মলু ধন সমস্যা এবং ঋণ সমস্যা। যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপীয় অথর্নীতি পনু র্গঠনের জন্য আমেরিকা উদারভাবে ঋণ দিতে থাকে। যুদ্ধের ক্ষতিপরূণ ও ঋণ পরিশোধের জন্য ইউরোপীয় দেশগুলি ব্যাপকহারে এই ঋণ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার লেনদেন নানা কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চেহারাকে সুদৃঢ় করতে পারে নি, তার মূলেও রয়েছে কতকগুলি কারণ। যেমন —

১। আমেরিকা প্রধান দুটি শর্তে ঋণ দিত। হয় নগদ সোনায় এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে নতুবা ঋণের সমপরিমাণ মূল্যের পণ্য দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

২। ইউরোপীয় দেশগুলির পথে তাদের উৎপন্ন শস্য সরাসরি আমেরিকার বাজারে রপ্তানী করা সম্ভব ছিল না।

৩। বাণিজ্যের প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রয়োগে হয়েছিল অনিশ্চয়তা ও আশঙ্খার প্রশ্নে তা ব্যহত হয়েছিল। কারণ দীর্ঘদিন পর ইউরোপীয় দেশগুলি এই ঋণ হয়ত অস্বীকার করত এই ঋণদান সঙ্কুচিত হয়েছিল।

৪।সমগ্র বাণিজ্য ব্যবস্থার মধ্যে একটি দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছিল।

৫। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই সঙ্কট সৃষ্টি করে।

৬। অস্বাভাবিক বেকারত্ব ও বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ না করার নীতি এই মহামন্দার প্রধান কারণ।

৭। এই সঙ্কটের অন্যতম কারণ ছিল প্রচুর পরিমাণ উৎপাদন যা এই সঙ্কটের তীব্রতর করে।

ট) আবিসিনিয়ার যুদ্ধ (১৯৩৫) ?

উত্তর ঃ-১৯৩০-এর দশকে ইতালীর আবিসিনিয়া অভিযান এবং আবিসিনিয়া যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত ও আশঙ্কিত করে তুলেছিল। একে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যায় না। ইউরোপে ন্যাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদের উদ্ভব তথা জার্মান ও ইতালীর আগ্রাসী বিদেশনীতির ফলশ্রুতি আবিসিনিয়ার যুদ্ধ।

প্রেক্ষাপট ঃ — আবিসিনিয়া আক্রমণে প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছিল ইতালীর ক্রমপরিবর্তনশীল বিদেশনীতি। মুসোলিনীর সাম্রাজ্যবাদী নীতির নগ্ন প্রকাশ ঘটে আফ্রিকায়। অর্থনৈতিক কারণে দীর্ঘদিন ধরে ইতালী পূর্ব আফ্রিকায় বিশেষতঃ আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী ছিল। ১৯২৮ খ্রীঃ ইতালী ও আবিসিনিয়ার মধ্যে একটি মৈত্রী চুক্তি হয়েছিল। ফ্রান্সের কাছ থেকে আফ্রিকার কিছু অঞ্চল ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করে ইতালী আবিসিনিয়া দখলে বদ্ধপরিকর হয়।

ওয়াল ওয়াল যদ্ধ ঃ —ইতালীর অধিকৃত সোমালিল্যান্ড ছিল আবিসিনিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সীমান্তবর্তী ওয়াল ওয়াল গ্রামে আবিসিনিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে সোমালিল্যান্ডে অবস্থিত ইতালীর বাহিনীর একটি সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে কিছু ইতালীয় সৈন্য নিহত হয়।

ইতালী কর্তৃক আবিসিনিয়াকে চরম সতর্কতা ঃ — এই ঘটনায় মুসোলিনী আবিসিনিয়া আক্রমণের অজুহাত খুঁজে পায় এবং আবিসিনিয়া সম্রাট হাইলেশেলাসীর কাছে ক্ষমতা প্রার্থণা ও প্রচুর ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। কিন্তু আবিসিনিয়া অগ্রাহ্য করলে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৩রা অক্টোবর ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে।

মলূ্যায়ন ঃ — এরফলে সম্রাট হাইলেশেলাসী আবিসিনিয়া ত্যাগ করে ইউ রোপে আশয় গ্রহ ণ করে। ইতালী সমগ্র আবিসিনিয়া অধিকার করে এবং জাতিসঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে আসে।

ঠ) ন্যাটো ?

উত্তর ঃ-ইউরোপের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলি অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্থা গড়ে তোলে। এরফলে সংস্থা গঠনকারী দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির যৌথ উদ্যোগ লক্ষ্য করে মন্তব্য করেন যে পশ্চিমী দেশগুলির রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ডানকার্ক চুক্তি (Dunkirk Pact), মার্চ, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ এবং বৃটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস্, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ব্রাসেলস্ চুক্তি (Brussels Pact), ১৭ই মার্চ, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ। এইসব চুক্তির শর্তানুযায়ী স্থির হয় যে চুক্তি ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির কোন একটি রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে যৌথভাবে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা হবে। এইভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্র বর্গ যখন রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলেছে সেই সময় সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক বার্লিন অবরোধ মার্কিন সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে এবং মার্কিন সেনেট এক প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারবে।

মার্কিন সেনেট -এর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ন্যাটো-এর উদ্ভব হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, লুক্সেনবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, ফ্রান্স, বৃটেন, ইতালী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনে মিলিত হয়ে 'উ ত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা, সংক্ষেপে ন্যাটো (North Atlantic Treaty Organisation Uá NATO) গঠন করে। পরবর্তীর্ কালে গ্রীস ও তুরস্ক এবং পশ্চিম জার্মানী যথাক্রমে ১৯৫২ ও ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে এই সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করলে মোট ১৫ টি রাষ্ট্র এই সংস্থার সদস্য হয়। ১৪টি শর্ত সম্বলিত এই সংস্থার চুক্তিপত্রে উল্লিখিত একটি শর্তে স্থির হয় যে, চুক্তিবদ্ধ কোন দেশ বৈদেশিক শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে সকলে যৌথভাবে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে বাধ্য থাকবে। তাছাড়া পারস্পরিক আর্থিক সাহায্য ও সহায়তার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ অর্থনৈতিক উ ন্নয়ণে তৎপর হবে। তবে এই সংস্থা গঠনের মলূ লক্ষ্য ছিল রাশিয়া তথা তার পরিচালিত জোটবদ্ধ রাষ্ট্র গুলির সম্পস্র ারণ রোধ। পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন পশ্চিমী জোটের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও জোটবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ণে সহায়তা এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

AMBITION